# খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

BanglaBook.org

# খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আলমগীর মুরতাজা

নাশাত

প্রকাশক
নাশাত পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৫১১৮০৮৯০০, ০১৭১২২৯৮৯৪১

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২০; রবিউস সানি, ১৪৪২

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ

সর্বস্বত্ব © নাশাত

মূল্য : ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র

আম্মা-আব্বা
আপনারা আমাদের ভাইবোনদের এখনো কেবল দু-হাত ভরে দিয়েই যাচ্ছেন, আমরা দিতে পারিনি কিছুই। আপনাদের সহস্র ঋণ এ জনমে শোধ করবার নয়। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা—এই বইয়ের সওয়াবটুকু তিনি যেন যুক্ত করেন আপনাদের আমলনামায়।
রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা।

—আলমগীর মুরতাজা

## অনুবাদকের কৈফিয়ত

এখানে বই নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা জুড়বার প্রয়োজন দেখছি না। 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' সম্পর্কে খানিক পরেই সমস্তকিছু বলবেন লেখক ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ; আমি বরং কিছু খুচরো আলাপ করি।

আমার ক্ষুদ্র লেখক-জীবনে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে, অনুবাদ-সাহিত্য নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমার প্রথম প্রকাশিত বইটি যে হবে অনূদিত, সেই ভাবনা মনের ভেতর উঁকিই দেয়নি কখনো। কিন্তু তাকদিরের খাতায় যা লেখা হয়ে গেছে, বাস্তবে তা-ই সংঘটিত হয়।

আমি মূলত কথাসাহিত্যের লোক। প্রথমদিকে কোনো গল্পগ্রন্থ কিংবা উপন্যাসের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করব—এমনই পরিকল্পনা এঁটেছিলাম। কিন্তু হুট করেই একটা ব্যক্তিগত জেদ থেকে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে উঠি।

কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে বড়সড় হোঁচট খাই—এ যে এক বিশাল সমুদ্র! তার উপর মানববিশ্বে তখন নেমে এসেছে প্রাণঘাতী মহামারি করোনা ভাইরাস। আমিও তখন মানসিক মারি ও মড়কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এজন্য পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন আবহে বারবার ভেঙে যাচ্ছিল মনের সংকল্পের দেয়াল। আশাহত হয়ে কয়েকবারই কাজ ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রতিবার ফুসফুস-ভর্তি সাহস নিয়ে ফের উঠে দাঁড়াতে পেরেছি।

পাশাপাশি নাশাত পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় আহসান ইলিয়াস ভাই বরাবর আমাকে তাগাদা দিয়ে গেছেন; অনুবাদ চলাকালে তরুণ ইতিহাসবিশ্লেষক মুহতারাম ইমরান রাইহান হাফিজাহুল্লাহর সঙ্গে যখনই যোগাযোগ হয়েছে, পরামর্শ দিয়ে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। কাজটি এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এই দুজনের তাগিদ ও ভালোবাসা অনেকাংশেই ভূমিকা রেখেছে।

মাঝেমধ্যে কিছু সহপাঠীও খোঁজখবর নিয়েছে, যা প্রাণশক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ একজন ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ। তার এই ব্যাপাক সাড়াজাগানো অসাধারণ গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই ইতিহাসের রক্ত হিম-করা এমনসব দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যেগুলো বহুবার প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছে আমার কলম।

হিজরি সপ্তম শতকে মধ্য-এশিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল খাওয়ারিজম। সেই খাওয়ারিজমের দুর্ধর্ষ বীর সুলতান জালালুদ্দীনের জীবন-বিসর্জনের শ্বাসরুদ্ধকর সহস্র অধ্যায় দেখে মস্তিষ্কে কখনো এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছে, মনে

হয়েছে—মগজের ঈষদুষ্ণ কোমল মাংসে কেউ যেন একটা সূক্ষ্ম আলপিন বসিয়ে দিয়েছে। বহুবার চোখ ভেঙে অজান্তেই নেমে এসেছে অশ্রুবিন্দু। এই এতদিন আমি যেন হিজরি সপ্তম শতকের বিধ্বস্ত মুসলিমবিশ্বের অস্থিস্তূপের ভেতর দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে ছুটে ফিরেছি। মহান আল্লাহ ইসলামের জানবাজ খাদেমদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

লেখক-জীবনের শুরুতেই এত দীর্ঘ পরিসরে কাজ করতে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। প্রকাশক মহোদয়ের ক্রমাগত তাগাদার দরুন কাজটি আমাকে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে করে যেতে হয়েছে। পুরো বইয়ের অনুবাদ অবশ্য তিন মাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলাম খাতার পাতায়। সেগুলো কম্পোজ করতে এবং বইটির গোছালো ও নান্দনিক একটি অবয়ব দাঁড় করাতে গিয়ে চলে গেছে আরো তিন মাস। যাক, আল্লাহর রহমতে তবু শেষ তো হয়েছে কাজ।

কিছু ক্ষেত্রে আমি পাঠকদের বোধগম্যতার জন্য ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছি। দু-তিনটে ঘটনায় ইচ্ছে করেই তৈরি করেছি গল্পের আবহ। এক্ষেত্রে পাঠশেষে পাঠকদের কোনো পরামর্শ থাকলে সাদরে গৃহীত হবে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। আমাদের স্খলন একটি স্বাভাবিক বিষয়। প্রিয় পাঠক, কোথাও যদি খানিক অসঙ্গতিও ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অবহিত করবেন; আমরা শুধরে নেবার জন্য সচেষ্ট থাকব।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমার যে কী পরিমাণ শ্রম দিতে হয়েছে, তা কল্পনাতীত। কিন্তু, কারুর প্রকৃত ইসলামি মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শ বিকাশে খানিক ভূমিকাও যদি পালন করতে পারে এই বই, আমার অজস্র বিনিদ্র রজনী সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ তায়ালা লেখক-অনুবাদক-প্রকাশক-পাঠকসহ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুসকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটিকে সবার নাজাতের উসিলা বানান। আমাদের সকলকে শহিদি মৃত্যুর জন্য কবুল করে নিন। দীনের পথে আবর্তিত যাবতীয় বাধা নির্ভয়ে উতরে যাবার তাওফিক দিন।

প্রিয় পাঠক, বইটি পড়ে অবশ্যই আপনার অনুভূতি ব্যক্ত করবেন। বই নিজের কাছে আটকে না রেখে পাশের কাউকে পড়ারও সুযোগ করে দেবেন। আর যদি অনুবাদকের উদ্দেশে আপনার কোনো মূল্যবান পরামর্শ থাকে, নিঃসঙ্কোচে তা জানাতে পারেন। আমাকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে আপনার সেই মূল্যবান পরামর্শ একপ্রকার জ্বালানি ও প্রাণশক্তিবর্ধক বলে আমি মনে করব। ওয়াস সালাম।

আলমগীর মুরতাজা
ঢাকা
১২.১২.২০২০
alamgirmurtaja@gmail.com

## কুরআনের আয়নায় দেখা ইতিহাস

আমি বনি ইসরাইলকে একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে, ভূপৃষ্ঠে তোমরা দু-বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং মারাত্মক দাপট দেখাতে আরম্ভ করবে। অতঃপর যখন ঐ দুটোর প্রথমবারের ওয়াদা আসবে, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী বান্দাদের আমি পাঠাব, যারা হবে খুব যুদ্ধবাজ। তারপর তারা তোমাদের ঘরবাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে তোমাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য।

এটা একটা কার্যকর ওয়াদা; সংঘটিত হবেই হবে। তারপর তোমাদের তাদের উপর প্রবল করে দেব আমি। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করব। জনসংখ্যার দিক থেকে বিরাট এক বাহিনীতে পরিণত করব তোমাদের।

যদি তোমরা ভালো কাজ করো, নিজেদের জন্যই করবে। আর যদি মন্দ করো তবে তা-ও তোমাদের নিজেদের জন্য।

অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি আসবে, তোমাদের বিরুদ্ধে ফের আমি অন্যদের কর্তৃত্ব প্রদান করব, যাতে তারা মেরে-মেরে বিকৃত করে দেয় তোমাদের মুখমণ্ডল। এবং প্রথমবার যেভাবে ওই লোকগুলো ঢুকে পড়েছিল মসজিদে, এরাও সেরকমভাবে প্রবেশ করবে। যাদের উপরেই এদের কর্তৃত্ব ও জবরদস্তি চলবে—সবাইকেই বরবাদ করে দেবে।

আশ্চর্যের কিছু না—তোমাদের রব হয়তো তোমাদের উপর অনুগ্রহশীল হবেন। আর তোমরা পুনরায় যদি সেই একই মন্দ কাজ করো, তা হলে তোমাদের সাথে আমিও ফের তা-ই করব। আর আমি কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছি।[১]

---

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং : ৪-৮। তরজমা বায়ানুল কুরআন থেকে

## হাদিসের আয়নায় দেখা ইতিহাস : ভবিষ্যদ্বাণী

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (১) কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মুসলিমরা এমন এক তুর্কি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ না করবে, যাদের চেহারা হবে ঢালের মতো চওড়া; প্রশস্ত। এ সম্প্রদায়ের লোকজন পশমের পোশাক পরিধান করবে। তাদের জুতোও হবে পশমের তৈরি।

(২) তোমরা কেয়ামতের পুর্বে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতো হবে পশমের তৈরি। চেহারার গঠন হবে এমন—যেন-বা চওড়া-প্রশস্ত এক ঢাল। মুখ হবে টকটকে লাল। চোখ ছোট-ছোট এবং খুব তীর্যক।

(৩) কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ তোমরা এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ না-করবে, যারা হবে ক্ষুদ্রাকার তীর্যক চোখ এবং চ্যাপটা-ছোট নাকবিশিষ্ট।[২]

সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার ও মুসলিমবিশ্বে ঘটে-যাওয়া তাতার-আগ্রাসনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী মহান ইমাম নববি (মৃত্যু : ৬৭৬) এইসব হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—নিঃসন্দেহে রাসুলের বলা আলামতগুলোর পূর্ণ ধারক এই তুর্কিরাই (অর্থাৎ তাতাররা)।[৩] তাদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধ বেধেছিল, সেদিকেই রাসুলের এসব হাদিসের ইঙ্গিত। আমাদের জামানায় এই লোকগুলো হাদিসে উল্লিখিত সবক'টি আলামত পুরোপুরি পেয়ে গেছে। মুসলমানরা এদের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছে, যা এখনও জারি আছে।[৪]

মোল্লা আলি বিন সুলতান আল-কারি বলেন—এটাই অধিক বোধগম্য যে, এই হাদিসগুলিতে চেঙ্গিজ খান ও তদীয় সহচরদের মাধ্যমে সংঘটিত ফাসাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে।[৫]

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে উমর আল-কুরতুবি রহ. এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন—রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

---

[২] সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[৩] তাতাররা ছিল তুর্ক ইবনে ইয়াফিস ইবনে নুহ আলাইহিস সালামের বংশধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তুর্কিদেরই প্রাচীন কিন্তু অপ্রসিদ্ধ একটি শাখা।

[৪] মুসলিম শরিফ, হাশিয়াতুল মিনহাজ শারহুল মুসলিম লিন-নাবাবি। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[৫] মিরকাত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৪২

এই ঘটনা হুবহু ঘটে গেছে। মুসলমানরা খাওয়ারিজমের সুলতানের নেতৃত্বে ইরাকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।[৫]

এই কাফেরদের মোকাবেলায় সুলতানকে আল্লাহ তায়ালা নুসরত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের নাটাই শেষ পর্যন্ত তাতারদের হাতেই থেকে গেছে। তারা ইরাকসহ অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে নিয়েছে। সে-সময় তাদের এত বড়-বড় সৈন্যদল আগ্রাসন চালাচ্ছিল—যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।[৬] মুসলিমদের থেকে তাদেরকে হটাবার মতনও কেউ ছিল না আল্লাহ ছাড়া।

তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে মনে হচ্ছিল—এরা ইয়াজুজ-মাজুজ, অথবা ইয়াজুজ-মাজুজের আগমনের পটভূমিকা হিসেবে এরা এসেছে।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি—তিনি যেন এদের হালাক করে দেন, এদের জমাটবদ্ধতাকে বিক্ষিপ্ত ও চূর্ণিত করে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু এ সম্প্রদায়ের সংখ্যা, এদের আধিক্য, শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, সেজন্য তিনি নসিহত করেছিলেন—তুর্কিদের তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেবে।

এখনও আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে এই কাফেরদের বিরুদ্ধে নুসরত ও বিজয়ের আশা রাখি।[৮]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় লেখেন—রাসুলের খবর অনুযায়ী এই ঘটনাগুলোর একাংশ ৬১৭ হিজরিতে সংঘটিত হয়ে গেছে। তুর্কিদের এক বিরাট বাহিনীর অভ্যুদয় ঘটেছে। তারা মা-ওয়ারাউন-নাহার বা ট্রান্স-অক্সিয়ানার ও খোরাসানের বাসিন্দাদের হালাক করে দিয়েছে। এদের হাত থেকে তারাই শুধু বাঁচতে পেরেছে, যারা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

পৃথিবী থেকে মুসলমানদের বরবাদ করে এরা গিয়ে কাহাস্তান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় রায়, কাজবিন, আবহার, যানজান, আরদাবিল ও আজারবাইজানের রাজধানী।[৯]

---

[৫] সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ উদ্দেশ্য। কারণ, তাতারদের তিনিই কয়েকবার পরাজিত করেছিলেন। তাতারদের মোকাবেলায় তার পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের একটিবারও বিজয় অর্জিত হয়নি।

[৬] এই রচনা ৬৩৭ হিজরির।

[৭] আলমুকহিম লি-আশকালা মিন তালখিসি কিতাবিল মুসলিম, ৭/২৩৮;

[৮] উমদাতুল কারি, বাবু কিতালিত তুর্কি

## লেখকের কথা

মুসলিমবিশ্বে ঘটে-যাওয়া তাতার-আগ্রাসনের লোমহর্ষক গল্পগাথাই মূলত এই শিক্ষামূলক কাহিনিকাব্যের প্রধান পটভূমি। তাতার হামলার মূল কার্যকারণ, পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া—বিস্তৃত পরিসরে সবকিছুই উঠে এসেছে চওড়া কাগজের বুকে।

এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মুখ-গহ্বর থেকে মুসলিম-বিশ্বের, বিশেষত, পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের প্রতিরক্ষায় সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জিহাদি অগ্রগামিতা কেমন ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে লেখা হয়েছে এই বই।

গা শিউরে-তোলা এই বিষয় নিয়ে আমার কেন লিখতে ইচ্ছে হল, প্রিয় পাঠক, অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে এই প্রশ্নের উত্তর।

হাদিসের গ্রন্থাবলির (বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি) কেয়ামতের আলামতবিষয়ক আলোচনায়, কেয়ামতের আগে মুসলিম ও তুর্কি জাতির যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, একাধিক সনদে এবং বিভিন্ন শব্দ সহযোগে। সেসব হাদিসে রয়েছে রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী। তাতে তুর্কিদের দৈহিক গঠন-প্রকৃতি পর্যন্ত বলে দিয়ে গেছেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধিকসংখ্যক হাদিসব্যাখ্যাতা দিলের পুরো একিন নিয়ে বলেছেন, মূলত তাতার-আগ্রাসনের প্রতিই ছিল এসব হাদিসের ইঙ্গিত। বিশেষত, হিজরি সপ্তম শতকের হাদিসব্যাখ্যাতাগণ, যারা তাতারদের আগ্রাসনের সময় জীবিত ছিলেন, দিব্যচোখে রাসুলের ওই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন ঘটতে দেখেছেন। হয়েছেন রাসুলের মুজেযা-প্রকাশের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

রাসুলের এসব হাদিস মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা আর ঐতিহাসিক-বাস্তবতার আলোকে আমাদের সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ, মন-মুচড়ে দেওয়া ঘটনাবলি এবং মুসলিমবিশ্বের ভয়াবহ বিপন্নতার গল্পগুলি আমাদের বড় সতর্ক করে তোলে; যেভাবে বিপদের আভাস পেতেই নিজের অজান্তে ছাতার মতো খাড়া হয়ে ওঠে হরিণের কান।

এই হাদিসগুলো সম্পর্কে আমি তখনও জানি না। তারপরও ইতিহাসপাঠের বদৌলতে আগে থেকেই এ বিষয়ের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। ইসলামের ইতিহাসে, বাগদাদ সাম্রাজ্যের পতন এবং তাতার ফেতনার অধ্যয়নের ভেতর সুলতান জালালুদ্দীনের বীরত্বগাথার প্রতি প্রথমদিকেই আমি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।

তারপর একদিন উল্লিখিত হাদিসগুলো সামনে এল, ফলে এই বিষয়টি আমার সামনে দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

ধীরে-ধীরে দিন কেটে যাচ্ছিল। একসময় মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর অনবদ্য গ্রন্থ 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) পড়ার সুযোগ মিলল। যার প্রথম খণ্ডে লেখক 'তাতার-ফেতনা এবং ইসলামের এক নতুন পরীক্ষা' শিরোনামে প্রায় বত্রিশ পৃষ্ঠার গবেষণাধর্মী একটি আলোচনা লিখেছেন। ওতে তাতার-আক্রমণের কার্যকারণ, তখনকার মুসলিমবিশ্বের দুর্দশাকবলিত চালচিত্র, দৈত্যের মতো নেমে আসা ভয়াবহ বিপর্যয় ও ক্রমান্বয়ে তাতারদের ভেতর ঘটে-যাওয়া ইসলামের প্রসার-বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে নির্মোহ গদ্যে নিরীক্ষা চালিয়েছেন। খুব সাহিত্যপূর্ণ, অলংকারসমৃদ্ধ ভাষায় খুলে দিয়েছেন চিন্তা-চেতনার নতুন নতুন সব জানালা।

এ বিষয়ের প্রতি ইতিহাসপাঠকদের আরও গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে করেছেন তিনি। কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন—'তথ্য এবং সময়—দুটোরই স্বল্পতা আর লেখকের কিছু ওজর থেকে যাওয়ার দরুন বলতে হচ্ছে, এই আলোচনায় আরও বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির অবকাশ আছে। এটাকে একপ্রকার প্রাথমিক প্রচেষ্টা আর ঈমানি চেতনার একটুখানি বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। আরও দ্বিগুণ অভিনিবেশের দাবি রাখে এই বিষয়।'

তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাতের লেখকের এই অঙ্গুলি-নির্দেশের ফলেই এ নিয়ে কাজ করতে প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠি আমি। ধীরে-ধীরে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নতুন নতুন দিক আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় সামনে চলে এল, যার উপর আলাদা আলাদা ঢাউস সাইজের কিতাব লিখে ফেলা যায়। কিন্তু, ফিলহাল আমি লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি তাতার-আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট, এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কার্যকারণ, সেই প্রলয়কাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ আর খাওয়ারিজম শাহি খানদান সম্পর্কিত জরুরি তথ্যানুসন্ধান।

লিখতে চেয়েছি সেই মহা সয়লাবের সামনে শক্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো মহান মুজাহিদিন, বিশেষত, সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের প্রাণান্তকর চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর জীবনোৎসর্গের অম্লান দাস্তান।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ইতিহাসের পাতার ভেতর ডুব দিতে লাগলাম আমি। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঘেঁটেঘুঁটে সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনগল্পের আখ্যানপর্বগুলো জমা করতে লাগলাম।

দীর্ঘ একটা সময় ধরে এই আশায় ছিলাম যে, সুলতানের জীবনের উপর লেখা নতুন অথবা পুরোনো কোনো পূর্ণাঙ্গ বইয়ের সন্ধান হয়তো পেয়ে যাব। আমার কাজটাও তাতে সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু সময়ে-অসময়ে বড় বড় কুতুবখানায় ঢুঁ মেরেও তেমন কোনো বই মেলেনি। এই মহান মর্দে মুজাহিদের জীবনবৃত্তান্ত আলাদাভাবে কোনো এক কিতাবে পেয়ে

উঠিনি। যেসব গ্রন্থে সুলতান জালালুদ্দীনের আলোচনা এসেছে, সেখানে অন্য কোনো আলোচনার ফাঁকেফুঁকে টুকিটাকি এসেছে কেবল। পূর্ণাঙ্গ না, ছেঁড়া-ছেঁড়া কিছু ঘটনা। শুধু তার জীবনী সংরক্ষণই সেসব গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

ইতিহাসে সুলতান জালালুদ্দীনের সংগ্রামমুখর জীবনযাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পরেও, যে বিন্যাস-বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যার দাবি রাখত ঐতিহাসিকদের কলমের কাছে, সেইসব টুকিটাকি আলোচনায় তার এক সুতোও উঠে আসেনি। আমার মনে তখন আবারও উদয় হল যে, হায়, এই মহান মুজাহিদের অসাধারণ কীর্তিগাথা যদি একসঙ্গে কোনো এক কিতাবে পেয়ে যেতাম!

এত খোঁজাখুঁজির পরেও যখন তেমন কোনো পূর্ণাঙ্গ বই আমার হাতে আসেনি, তখন হঠাৎই একদিন মনে হল, সুলতানের জীবনীভিত্তিক যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে আমি নিজেই কেন আলাদা একটা বই লিখে ফেলছি না? জানি, শত অযোগ্যতা রয়েছে আমার। রয়েছে পুঁজির স্বল্পতা। তবু সময়ের বিশেষ প্রয়োজন এবং সুলতান জালালুদ্দীন রহ. এর পক্ষ থেকে অর্পিত গুরুভার ভেবে এই কাজের বোঝা আমার এই দুর্বল কাঁধেই তুলে নিয়েছি।

তখন শাওয়াল মাস, হিজরি ১৪১৮। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ ঈসাব্দ। একদিন হঠাৎ পরম করুণাময়ের নামে আমি লিখতে বসে গেলাম—বিগত আট শতাব্দী ধরে উম্মাহর আলেমদের উপরে বর্তে ছিল যার মহা দায়ভার।

মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় সুলতান জালালুদ্দীনের সুমহান কীর্তিগাথাকে উপজীব্য করে সাজানো এই বিষয় ছিল খুব গভীর, খুবই বিস্তৃত। ফলে সময়ের শক্ত আবরণ ছিঁড়ে-খুঁড়ে বাস্তব ইতিহাস তুলে আনতে গিয়ে এমন অনেক বিষয় সামনে এসে গিয়েছিল, যেগুলো হয়ে উঠেছিল দ্বিগুণ তাহকিক আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবিদার।

ইতিহাস এমনই এক শক্ত-নিরস-কঠিন বিষয় যে, বিভিন্ন এলাকার ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখককে কখনও আবেগী আর একপেশে হয়ে উঠলে চলে না। নির্মোহ-নিরাসক্ত গদ্যে তুলে আনতে হয় বাস্তবতা, 'রিওয়ায়াত' আর 'দিরায়াত' শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান না-থাকলে যা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যদি নির্ধারিত বিষয়ে পূর্ব-লিখিত কোনো বই-ই না থাকে, তা হলে কাজ যে কতটা কঠিন হয়ে ওঠে, সে-কথা সব জ্ঞানী বন্ধুই খুব ভালো জেনে থাকবেন।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে কখনও পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছে, ইতিহাসবিদদের পরস্পর-বিরোধী মতামতের দরুন মাঝেমধ্যে আমি খুব বিমূঢ় হয়ে গেছি যে, আচ্ছা, এই জানবাজ বাদশাহ কি স্রেফ স্বাজাত্যবোধ, বংশগৌরব কিংবা গোত্রকৌলিন্যের জন্য লড়াই-করা সৈনিকদের লিডার ছিলেন?

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে সুলতান জালালুদ্দীনের নাম যেখানেই 'এক দুঃসাহসী যোদ্ধা' হিসেবে এসেছে, সেখানে ভিন্ন বর্ণনায় একথাও লেখা থাকতে দেখেছি, তিনি একজন পরাজিত সিপাহি মাত্র, একজন বেপরোয়া যোদ্ধা আর এক অপরিণামদর্শী

বাদশাহ, যিনি ইতিহাসের বিশাল ক্যানভাসে নিজের উল্লেখযোগ্য কোনো চিত্রই এঁকে যেতে পারেননি। তলোয়ার নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঝাঁপাঝাঁপি করে একসময় শীতের হলুদ হয়ে-যাওয়া পাতার মতোই টুপ করে ঝরে গেছেন।

এ-ধরনের কিছু ইতিহাসবেত্তার দোষারোপ আর প্রশ্নবিদ্ধকারী বয়ানে আমি খুব প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল সুলতানকে একজন জানবাজ সেনাপতি হিসেবে উপস্থাপন করাটা অতিরঞ্জন হয়ে যাবে। যারা তাঁর প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটিয়েছে, তারা ইতিহাসপাঠে বোধহয় পরিচয় দিয়েছে নিজেদের অযোগ্যতার।

অথচ তখন আমি এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের দুইশ পৃষ্ঠার কাছাকাছি লিখে ফেলেছি। কিন্তু আমার ভেতর কেমন যেন একটা দ্বিধা-জড়তার কাঁটা বিরামহীনভাবে খচখচ করে চলছিল। সুলতানের ব্যাপারে আমার আকিদা ছিল কেমন, আর এখন আমি কী-সবের মুখোমুখি! ভাবলাম—যাহ, আমার পুরো পরিশ্রমটাই জলে গেল। এবং তখন লেখা বন্ধ করে কাগজ-কলম তুলে রেখে দিলাম।

তারপর হঠাৎ একদিন, কেন জানি না, আমার ভেতর খুব জেদ চেপে গেল যে, কালের শক্ত খোলস ভেঙে প্রকৃত ইতিহাস আমি বার করে আনবই। হোক না যতই অপ্রীতিকর, তিক্ত-বিস্বাদ। তখন পর্যন্ত আমার পাঠ-তালিকায় ছিল শুধু ওই সমস্ত বই, যেগুলো বাজারে অন্যান্য ইসলামি বইয়ের পাশেই অহরহ পাওয়া যেত। অথবা বড় বড় কুতুবখানাতে গিয়ে খোঁজ করলেই মিলে যেত। কিন্তু, এরপর থেকে আমি এই বিষয়ের সমস্ত বিরল-দুর্লভ গ্রন্থ-সন্ধানের বিপুল কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ি। ছোটাছুটি করি নানান জায়গায়। এবং গভীর পাঠ-মগ্নতার পর আবিষ্কার করে উঠি, পূর্বের বিকৃত কিছু ইতিহাস পড়ে সুলতানের ব্যাপারে যে বিপুল অনীহা, যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া গেঁথে গিয়েছিল আমার ভেতর, তা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন।

তথ্যানুসন্ধান আর পাঠের গভীরতা ক্রমাগত যতই বাড়তে থাকল, ততই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল সুলতানের জীবনগল্পের অজানা সব নতুন নতুন অধ্যায়। ধীরে-ধীরে উঠে যেতে লাগল মনে গেঁথে-বসা বিভিন্ন প্রশ্ন-আপত্তির সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কাঁটা। এবং একসময় খুব গভীরভাবে অনুভব করে উঠলাম, সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ রহ. এর অসামান্য নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্ব, পুবাকাশে প্রভাত-রোদের বিকিরণ ছড়িয়ে জেগে-ওঠা লাল সূর্যের মতোই আমার সামনে এখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, পুরোপুরি।

এই বইয়ের একটি নির্ভুল পাণ্ডুলিপি দাঁড় করাতে গিয়ে বহু দিনরাত আমি বিরামহীনভাবে খেটে গেছি। প্রকৃত তথ্য-তালাশে, ইতিহাসের নিখুঁত বিন্যাসে বহু-বহুদিন নিমজ্জমান হয়ে থেকেছি আকণ্ঠ। বলা চলে, আমার তখন ল্যাজে-মুড়োয় নাজেহাল অবস্থা। তবু, ইতিহাসের অচেনা-অজানা চোরাগলি বেয়ে আসল বাস্তবতা তুলে আনতে পেরে আজ আমার খুব আনন্দ লাগছে।

সুলতান জালালুদ্দীনের উপর আরোপিত যত প্রশ্ন-আপত্তি আছে, সেসব মূলত তার প্রকৃত জীবন সম্পর্কে না-জানার ফসল। তার ব্যাপারে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি

ছড়িয়ে গেছে। মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় তার যে কী দারুণ জিহাদি উদ্দীপনা ও অগ্রগামিতা ছিল, তা না-জানার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এসব।

তিক্ত বাস্তবতা হল, ইতিহাসের মাত্র দু-চারটে বই যে ব্যক্তি পড়ে উঠেছে, তার মধ্যে সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে অমন বিকৃত ভাবনাই বাসা বাঁধবে যে, অসামান্য সাহসিকতা সত্ত্বেও একজন অযোগ্য শাসক ছিলেন তিনি, যাকে মুসলিম শাসকদের বর্ণিল কীর্তিগাথার সামনে উল্লেখযোগ্য কোনো আসনই দেওয়া যায় না।

কিন্তু গভীর মনোযোগ আর প্রখর অনুসন্ধানী চোখে কেউ যদি হালের সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করে ফেলে, গড়ে তোলে গভীর-বিস্তৃত পাঠ-পরিধি, এবং খুব সতর্ক দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর উপর বয়ে যাওয়া সেই ভয়াবহ ফেতনা আর সুলতান জালালুদ্দীনের তাজাপ্রাণ জিহাদি অগ্রগামিতার একটি তাত্ত্বিক নিরীক্ষণ করে ওঠে, তবে শুধু অসংখ্য ভুল ধারণারই অবসান ঘটবে না, ইসলামি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে-দেওয়া যুগান্তকারী সেই দুর্যোগে সুলতান জালালুদ্দীন রহ. এর দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রাও হয়ে উঠবে স্পষ্ট।

একথাও খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে যে, পামির মালভূমি থেকে নিয়ে কোহেকাফ পর্যন্ত এবং কাসপিয়ান সাগর থেকে সিন্ধু-তীর পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদি অভিযাত্রার এমন সব মহান কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল, যা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ. এর জিহাদ থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না।

মুসলিম সুলতান এবং বিজেতাদের মধ্যে সুলতান জালালুদ্দীনই সেই অনন্য-বিরল বাহাদুর, যিনি পৃথিবীর এমন চারটে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যারা ছিল পুরো মুসলিমজাতির শক্ত দুশমন।

তিনি মোঙ্গলিয়া থেকে ধেয়ে আসা তাতারদের আক্রমণের মুখে মুষ্টিবদ্ধ যুদ্ধে নেমেছিলেন। তারই ধারালো তরবারি হিন্দুরাজাদের হাত থেকে স্বাধীন করেছিল উপমহাদেশের বিশাল-বিস্তৃত এলাকা। তিনি ক্রুসেডারদের (খ্রিষ্টানদের) সাথেও জিহাদ করেছেন। তাদের থাবার ভেতর থেকে জর্জিয়াকে বার করে এনেছিলেন, এবং প্রথমবারের মতো একে করেছিলেন পূর্ণরূপে ইসলামি হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত। তারই তরবারি ঝলসে উঠেছিল বাতেনি ফেদাইদের খঞ্জরের মোকাবেলায়। এবং ইসলামের এই দুশমনদের তিনি এমনভাবে থেঁতলে দিয়েছিলেন যে, তারা আর মাথাই ওঠাতে পারেনি বহু শতাব্দীকাল।

আফসোস, তার এই মহান কীর্তির কথা যত্ন নিয়ে কেউ সংরক্ষণ করেনি ইতিহাসের পাতায়। বড় অনীহা দেখানো হয়েছে। উচিত তো ছিল তার একনিষ্ঠ জিহাদ আর সুচিন্তিত পদক্ষেপ থেকে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে আলোকবিভার সঞ্চার করা। তার অসামান্য বীরত্বগাথা এবং প্রতিরক্ষামূলক দুঃসাহসিকতা থেকে গভীর পাঠ গ্রহণ করা।

একারণে আমি জরুরি মনে করেছি যে, যেখানেই পাঠকদের সামনে উন্মোচিত করব সুলতান জালালুদ্দীনের জীবননামার অচেনা-অজানা সব জানালা, সেখানে পাশাপাশি তার ব্যাপারে ছড়িয়ে-পড়া ভুল ধারণাগুলোরও শেকড় কেটে দেব। ফুটিয়ে তুলব দীপ্ত সত্য সব কাহিনিকাব্য, যেন পাঠকদের ভুল ধারণার কবলে পড়তে না হয়, জানতে পারেন ইতিহাসের আসনে সুলতানের প্রকৃত অধিষ্ঠান কেমন ছিল।

এই গুরুভার সম্পন্ন করতে আমি নিচের কয়েকটি বিষয়ের পথ ধরে হেঁটেছি—

১. প্রকৃত ইতিহাসের দুর্লভ উৎসের অনুসন্ধান। পরম মমতায় ও একনিষ্ঠ মগ্নতায় বাস্তবতা তুলে আনা।
২. গভীর পাঠপর্ব।
৩. পরস্পর-বিরোধী বর্ণনাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করে তাতবিক তথা সামঞ্জস্য-বিধানের পথ বের করা। অথবা, দিরায়াতশাস্ত্রের মূলনীতি মেনে কিছু বর্ণনাকে অন্য বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া।
৪. পরস্পর-মিলিত বর্ণনাগুলো, যাতে একই ঘটনা বলা হয়েছে, সেসবের টুকরো টুকরো অংশকে ধারাবাহিকভাবে একসঙ্গে মেলানো, সুসম্পন্ন এক অবয়ব দেওয়া।
৫. শেষমেশ, অর্জিত সমস্ত তথ্য-উপাত্ত বিন্যস্ত করে প্রাঞ্জল এক গদ্যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাওয়া।

হ্যাঁ, আমি এমনভাবে লিখে গেছি সব ঘটনা, সাহিত্যের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে গদ্য। ফুটে উঠেছে জীবন্ত সব দৃশ্যকল্প। আমার উদ্দেশ্য, যেন পাঠকের কাছে বইটি খুব ভারী না ঠেকে—সাধারণত ইতিহাসপাঠে যেমন অভিজ্ঞতা হয় সবার। মোটকথা, ছত্রে-ছত্রে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে চেয়েছি পুরো মাত্রায়। ইতিহাস-বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাহিত্যের মিষ্টি ছোঁয়াও আমি পুরোপুরি ছড়িয়ে দিয়েছি।

এই পাঁচটি কর্মপদ্ধতির ভেতর প্রথম এবং পঞ্চমটি ছিল সবচেয়ে কঠিন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রহণযোগ্য কিতাব খুঁজে বের করা কিন্তু সহজ কথা না! নাগালের ভেতর যা পেয়েছি, সেসবে তথ্য খুবই কম ছিল। একসঙ্গে এক কিতাবে সব পাওয়া যেত না। বিচ্ছিন্নভাবে একটু-একটু থাকত। অধিকাংশ গ্রন্থেই তার আলোচনা তেমন পেতাম না। খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর ছিল।

তবু অনুসন্ধান চলতে থাকল বিরামহীন। শেষমেশ আমাকে ছুটতে হয়েছে দেশের বড়-বড় সব কুতুবখানায়, নাওয়া-খাওয়া একরকম ভুলে গিয়ে বলা যায়। ফলে বিশেষ-বিশেষ কিছু তথ্য হস্তগত হয়েছে। কিন্তু তবু, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যদি কখনও তা মিলে যায়, তা হলে ভবিষ্যতে খুব উপকারী চমৎকার কিছু সংযোজন হতে পারে।

ইতিহাস সংকলনের বেলায় বিভিন্ন ঘটনার দিন-মাস-বছরের সঠিক বর্ণনা দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি যে-কাজে ডুব দিয়েছি, তার অনেক ঘটনার সঠিক দিন-ক্ষণের উল্লেখ নেই কোথাও। অনেক ঘটনার বর্ণনায় বড়সড় মতপার্থক্যও ঘটে গেছে।

এ পরিস্থিতিতে, কিছু জায়গায় আমি তাতবিক তথা পূর্বাপর বিষয়গুলোর পারস্পরিক সমতা-বিধানের মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দিয়েছি। মাস-বছরের আন্দাজ নিজেকেই করে নিতে হয়েছে। কিছু জায়গায় ঐতিহাসিক মতপার্থক্যের ভেতর তারজিহের (প্রাধান্যদান-নীতি) পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বড় মেহেরবানি ও সাহায্য যে, ১৩ বছর ধরে আমার মতো অযোগ্য লোকের হাতে এই কাজ সম্পন্নতা পেয়েছে। তার অপার কৃপা না-হলে এ কাজে আবর্তিত কঠিন-কঠিন সমস্যা উতরে যাবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

এই সংকলনে শুধু শুকনো-খটখটে লাগামহীন গদ্যে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যাওয়া হয়নি, কিতাবের প্রায় সব জায়গায় তরতাজা সব চিত্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে, যেন এখনই তার চোখের সামনে ঘটছে সব ঘটনা। কারণ, যখন ইতিহাস খুঁজতে নেমেছি আমি, বারবার মনে হয়েছে, আমিও যেন চলে গেছি ওইসব ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী রণাঙ্গনে। চোখের সামনে ঘটতে দেখছি বেদনাবিধুর সব দৃশ্য। এজন্য পাঠকদেরকেও দৃশ্যকল্পের ভেতর দিয়ে আটশ বছর আগের সেই খুনরাঙা প্রান্তর থেকে ঘুরিয়ে আনতে চেয়েছি।

বিশেষত, যখনই কোনো ইতিহাসবিদ হকের জানবাজ মুজাহিদ আর বাতিলপন্থিদের মুখোমুখি যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন, বাতাসে একসঙ্গে অসংখ্য তির ছুটে যাওয়ার সাঁ-সাঁ শব্দ, বুকে-পিঠে তির বেঁধার খচখচ আওয়াজ আর চকচকে তরবারির ঝলকানি ভেসে উঠেছে আমার কল্পনায়। আমার পাঠকদেরও আমি সেই অনুভূতির দোরগোড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছি।

অন্যভাবে বললে বলা যায়, এই বই শুধু বিশ্লেষণের জন্যই বিশ্লেষণ না, বরং ইতিহাস থেকে ইবরত তথা শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান করবার জন্য বিশ্লেষণ।

এই কিতাব বিস্তর বিশ্লেষণী মেজাজে না লেখার আরেকটি বড় কারণ, পরস্পর-বিরোধী ঘটনাগুলির উপর বিস্তারিত আলোকপাত, তাতবিক অথবা তারজিহ-পদ্ধতি অবলম্বন এবং পাশাপাশি দলিল-প্রমাণ উল্লেখের দায়িত্ব যদি কাঁধে তুলে নিতাম, তবে স্পষ্টতই এই কাজ দুঃসাধ্য ছিল। এবং কিতাবের কলেবরও বেড়ে যেত কয়েক গুণ। আর পাঠকদের এত মোটা বই কেনা শুধু কঠিনই হতো না, বিশ্লেষণধর্মী লোহা-লক্কড়পূর্ণ বইপাঠের আগ্রহও অনেকখানি দমে যেত।

আবার এর অর্থ এই নয় যে, মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলি এমনি-এমনি ছেড়ে দিয়েছি, চিন্তাগবেষণা করে লিখিনি! বরং, এইসব বর্ণনায় আমি গভীর নজর দিয়েছি, এবং যেখানে সমতা-বিধান সম্ভব হয়নি, প্রাধান্য দিয়েছি। এজন্য যথাসম্ভব সম্ভাব্য বিভিন্ন দলিল ও আলামতের আশ্রয় নিয়েছি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব রুচিবোধের ছাঁচে বেছে নিয়েছি নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা। পাঠকদের দোলাচলের ভেতর থেকে তুলে আনতে যথাসম্ভব মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলো এড়িয়ে গেছি। পরিবর্তে গ্রহণ করেছি প্রাধান্যযোগ্য কোনো বর্ণনা। অথবা

এমন গদ্যভঙ্গিতে সাজিয়েছি, যা দ্বারা অন্যসব বর্ণনার মধ্যে পারস্পরিক একটা সমতা দাঁড়িয়ে গেছে। কিংবা আগের তুলনায় মতবিরোধ কমে গেছে অনেকখানি।

কিছু স্থানে কিতাবের মূলপাঠে, না-হয় পাদটীকায় বিরোধপূর্ণ বর্ণনার প্রতি নির্দেশ করেছি। কখনও ভুল বর্ণনার উপর ছোটখাটো আলোচনাও করে গেছি।

আমার মনে হয়েছে, ইতিহাসে সুলতান জালালুদ্দীনের সঠিক অবস্থান পাঠক ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করে উঠতে পারবে না, তার উদ্দাম অভিযাত্রার সুকঠিন অধ্যায়গুলো যতক্ষণ জেনে না-উঠবে।

ফলে, এই প্রয়োজনবোধেই আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে দুখণ্ডে লিখেছি। প্রথম খণ্ডে সেইসব প্রাথমিক পটভূমি সাজিয়ে তুলেছি, যার ছাঁচে ফেলে সুলতানের প্রাণান্তকর মেহনত-মুজাহাদার একটা বিচার করে ওঠা যাবে। বলা যায়, সুলতানের জীবন-কীর্তির একপ্রকার ভূমিকাই প্রথম খণ্ড। এতে বিভিন্ন ঘটনার প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় ফাঁকে-ফুঁকে তার জীবনচিত্রের টুকটাক ঝলক ফুটেছে মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পঙক্তিই সুলতানের জিহাদি প্রেক্ষাপটের গল্প বলা শুরু করে দেয়। একদম তার ক্ষমতাগ্রহণ থেকে শাহাদাত পর্যন্ত যাবতীয় আখ্যানের বর্ণনা চলে এসেছে।

বলি, খুব মনে রাখবেন, এটি সুলতানের সমস্ত জীবনকাহিনির অনুপুঙ্খ বর্ণনা নয়। বরং, উম্মাহর সেই দুর্যোগের কালে সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদি কীর্তিকলাপের প্রতি আলোকপাত-মাত্র। এজন্য তার জীবনের সেইসব পর্ব, যা কোনোভাবেই আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না, খুব সতর্কতায় এড়িয়ে গিয়েছি। সে বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের এ কিতাবের উৎসমূল গ্রন্থসমূহে ফিরে যেতে বলব। সেখানে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এও ভুলে যাবেন না, তার জীবনের আখ্যানপর্ব নিয়ে আমি যে পাণ্ডুলিপিটি সাজিয়েছি, তা মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষা-ক্ষেত্রে সুলতানের দরদমাখা জীবনোৎসর্গের গল্প। আমরা কখনও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তার কিছু ত্রুটিও দেখে উঠব। কিন্তু সেই দুর্বলতার কারণে তার প্রতিরোধমূলক ভূমিকাকে একদম নাকচ করে দেওয়া ভুল। নিতান্তই ভুল। ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম ছাড়া কেই-বা পবিত্র থাকতে পারে?

আমি চাই, এই কিতাব আপনি এমন এক মনোভাব নিয়ে পড়ুন যে, লেখক আমার সামনে এক মুসলিম বাহাদুরের টুকরো-টুকরো গল্প বলে যাচ্ছেন। এতে তার উদ্দেশ্য, যেন আমিও তার হৃদয়ের গভীর আকুতি শুনতে পাই, সেই অনুযায়ী আমল করি, এ থেকে দুঃসাহসিকতার পাঠ আর শিক্ষার উপকরণ গ্রহণ করি।

প্রিয় পাঠক, আমি হৃদয়ের পূর্ণ আকুতি মিশিয়েই লিখতে চেয়েছি এই বই। পড়তে পড়তে আপনিও যদি আমার হৃদয়ের সেই উত্তাপ, সেই গভীর প্রভাব নিজের মাঝে অনুভব করে ওঠেন, দীনের পথে আবর্তিত বিভিন্ন সাময়িক দুর্যোগে ও

দুর্বিপাকে ভয় না পান, হৃদয়ের গভীরে যদি লালন করেন সত্যে অবিচলতার মুষ্টিবদ্ধ সংকল্প, বুঝব, আমার এ রাতজাগা পরিশ্রম বিফলে যায়নি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফজল ও করমে, ১৪১৮ হিজরির শাওয়াল মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮) গৃহীত এ কাজ ১৪৩১ হিজরির পবিত্র রমজানে (আগস্ট, ২০১০) পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে।

আমার মতো দুর্বল অযোগ্য লোকের হাতে এই মহান কর্মের আঞ্জাম কেবল স্রষ্টার অপার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে।

বান্দা আজ পুরোপুরি হয়রান, সে এই মহিমান্বিত তাওফিক পেয়ে কোন ভাষায় তার মালিকের শুকরিয়া আদায় করবে?

اللهم لک الحمد کما انت اهله اللهم لا احصی ثناء علیک الا کما اثنیت علی نفسه

সংকলনটির পাতায় ভাঁজে-ভাঁজে যৎসামান্য কল্যাণ যদি থাকে, তা আমার রবের তরফ থেকে। যত ত্রুটি আর অকল্যাণ রয়েছে, সব আমার পক্ষ থেকে ঘটেছে।

শেষমেশ একজনের কথা না বললেই নয়। প্রিয় বন্ধু মাওলানা রাশিদ আহমাদ মুনিব এই গ্রন্থ নির্ভুলকরণে দারুণভাবে খেটে গেছেন। বহু উপকারী বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় পাদটীকাও জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সহযোগী বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
করাচি
১০ রমজান ১৪৩১; ২০ আগস্ট ২০১০
সময় : রাত ৩টা

# সূচিপত্র

**প্রথম অধ্যায় : খাওয়ারিজম ও খাওয়ারিজমের বাদশাহগণ**

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান।। ৫৫
প্রাচীনকালের খাওয়ারিজম।। ৫৬
খাওয়ারিজমে ইসলাম ।। ৫৬
কাস ও জুরজানিয়া ।। ৫৬
ইসলাম-যুগের খাওয়ারিজমি শাসক ।। ৫৭
খাওয়ারিজমের প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক ।। ৫৮
কুতুবুদ্দীন ইবনে আনুশতেগিন ।। ৫৮
মুজাফফর উদ্দীন আতসিয ।। ৫৮
ইল আরসালান ।। ৬০
সুলতান শাহ ও আলাউদ্দীন তাকিশ ।। ৬০
পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যের চালচিত্র ।। ৬১
তুর্কানেখাতা ।। ৬১
আব্বাসি খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ।। ৬২
সিরিয়া ও মিশর সাম্রাজ্য ।। ৬৪
ঘুর সাম্রাজ্য ।। ৬৬
শিরাজের আতাবেগ ।। ৬৭
ইরাকের সেলজুকগণ ।। ৬৭
রোমের সেলজুকগণ ।। ৬৮
আজারবাইজানের আতাবেগগণ ।। ৬৮
আলামুত ।। ৬৮
ইরবিল ।। ৬৮
সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশের শাসনকাল ।। ৬৯
খলিফা নাসিরের অস্থিরতা ।। ৬৯
তুর্কানেখাতার দুঃখের দিন ।। ৬৯
হাসান ইবনে সাব্বাহর অনুসারীদের সাথে লড়াই ।। ৭০
সুলতান তাকিশের জীবন নিয়ে পর্যবেক্ষণ ।। ৭২
তাকিশের ক্ষমাশীলতা ও সদাচারের একটি ঘটনা ।। ৭৩

## দ্বিতীয় অধ্যায় : সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের ক্ষমতাগ্রহণ

ঘুরিদের সাথে লড়াই ।। ৭৫
তুর্কানেখাতার সাথে লড়াই ।। ৭৭
সাইয়েদ মুবতাজার অন্তর্দৃষ্টি ।। ৮০
দুশমনের বন্দিশালায় ।। ৮০
ভেতর-বাইরের যুদ্ধ ।। ৮৩
তুর্কানেখাতার শেষপরাজয় ।। ৮৩
কিশলুক খানের সাথে যুদ্ধ ।। ৮৫
গজনি দখল ।। ৮৬
সম্রাজ্ঞী তুর্কান খাতুন : রাজ-ব্যবস্থাপনায় ভাঙন ।। ৮৬
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ।। ৮৭
ফসলের প্রাচুর্য ।। ৮৯
কারিগরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ।। ৯০
খনিজ সম্পদ ।। ৯১
শহরগুলোর চালচিত্র ।। ৯১
মসজিদ ।। ৯১
অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ।। ৯২
জ্ঞানচর্চা ।। ৯২
অপার মায়াবী কুদরতি দৃশ্য ।। ৯৩
বিভিন্ন মৌসুম ।। ৯৪
ভৌগোলিক পর্যালোচনা ।। ৯৫

## তৃতীয় অধ্যায় : চেঙ্গিজ খান

গোবি মরুভূমির ভূত ।। ১০০
মোগল ।। ১০১
তেমুজিন ।। ১০২
তেমুজিনের প্রথম বিজয় ।। ১০৪
উঁগ খান ।। ১০৪
কুরুলতাই ।। ১০৫
খাতা (চীন) হামলার ফন্দি ।। ১০৬
পূর্বপ্রস্তুতি ও গুপ্তচরবৃত্তি ।। ১০৬
যুদ্ধের বাহানা ।। ১০৭
কারাকোরামে বিশ্রামগ্রহণ ।। ১০৮
তাতারদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ।। ১০৯
ইয়াসার নিয়ম-নীতি ।। ১০৯
সূক্ষ্ম পন্থায় আক্রমণ ।। ১১০

ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতন ।। ১১১
হাড্ডির পাহাড় ।। ১১১
তাতারদের ধর্ম ।। ১১১
কিশলুক খানকে শায়েস্তা ।। ১১২
চীনা মুসলমান ।। ১১৩
জরুরি জ্ঞাতব্য ।। ১১৩

**চতুর্থ অধ্যায় : শাহজাদা জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি**

জন্ম ।। ১১৫
সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি ।। ১১৫
শিক্ষানবিশি ।। ১১৬
ইমাম রাজির শিষ্যত্বগ্রহণ ।। ১১৬
সেনাদলের দীক্ষা ও দায়িত্ববোধ ।। ১১৮
জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ।। ১১৯
জালালুদ্দীনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ।। ১১৯

**পঞ্চম অধ্যায় : বিপদের ঘনঘটা**

উম্মাহর সামষ্টিক অধঃপতনের প্রধান পাঁচ কারণ ।। ১২২
দুনিয়ার মোহ ।। ১২৩
জিহাদ ত্যাগ ।। ১২৪
আল্লাহর দীনপ্রচারে অলসতা ।। ১২৫
আকিদাগত ভ্রান্তি ও দুর্বলতা ।। ১২৭
পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ।। ১২৭
অযোগ্য বাস্তবতা ।। ১২৮
গায়েবি বিপদ ।। ১২৯

**ষষ্ঠ অধ্যায় : ভীতিকর ভবিষ্যদ্বাণী ও তাতার-আগ্রাসনের কারণ**

আল্লাহওয়ালাদের ভবিষ্যদ্বাণী : গায়েবি ইশারা ।। ১৩৪
শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার ভবিষ্যদ্বাণী ।। ১৩৪
সাইয়েদ মুরতাজা শাদইয়াখির বাণী ।। ১৩৫
পাখির ডাক ।। ১৩৬
তাতার-আগ্রাসনের কিছু কারণ ।। ১৩৮
প্রথম কারণ : খাওয়ারিজম শাহ ও বাগদাদের খলিফার বৈরী সম্পর্ক ।। ১৩৮
শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দির আগমন ।। ১৩৯
খাওয়ারিজম শাহের খলিফা নাসিরের খেলাফত অস্বীকার ।। ১৪৪
খাওয়ারিজম শাহের যুদ্ধযাত্রা ।। ১৪৫
তুষার ঝড়ের কবলে ।। ১৪৫

বিরল কাণ্ড ।। ১৪৭
বঞ্চনা ।। ১৪৭
সাম্রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারা ।। ১৪৮
আক্রমণের দ্বিতীয় কারণ ।। ১৪৯
তৃতীয় কারণ : চুক্তিনামা ।। ১৫০
চেঙ্গিজ খানের দোদুল্যমানতা ।। ১৫৩
চতুর্থ কারণ : খলিফা নাসিরের ষড়যন্ত্র ।। ১৫৪
খলিফা নাসিরের পরামর্শসভা ।। ১৫৪
ইবনুল আসিরের সাক্ষ্য ।। ১৫৬
পঞ্চম কারণ : খাওয়ারিজম শাহের বোকামি ।। ১৫৬
কাফেলা ।। ১৫৭
বার্তাবাহক হত্যা ।। ১৬০
চেঙ্গিজ খানের পরিকল্পনা ও গোয়েন্দা-ব্যবস্থা ।। ১৬৩
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ ।। ১৬৫
শিয়া ও বাতেনি ফেরকার গাদ্দারি ।। ১৬৬
খলিফা নাসির শিয়া : দলিল কী? ।। ১৬৬

**সপ্তম অধ্যায় : মুসলিমবিশ্বে চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ**

চেঙ্গিজ খানের ঝোঁধাগ্নি ।। ১৬৯
তাতার-বাহিনীর সঠিক সংখ্যা ।। ১৭০
ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদের ভুল ।। ১৭০
প্রথম হামলা ।। ১৭১
জোচি খানের অগ্রযাত্রা ।। ১৭২
জোচিকে প্রদত্ত নির্দেশনা ।। ১৭২
খাওয়ারিজম শাহের পরামর্শ ।। ১৭৩
খাওয়ারিজমি বাহিনীর সীমান্তের দিকে রওনা ।। ১৭৫
শাহজাদা জালালুদ্দীন তাতারদের ঘাঁটিতে ।। ১৭৫
তুকতুগানের সাথে জোচির মোকাবেলা ।। ১৭৬
মুসলমান ও তাতারদের মাঝে প্রথম যুদ্ধ ।। ১৭৯
যুদ্ধের নাজুক মুহূর্ত ।। ১৮০
জালালুদ্দীনের পালটা আক্রমণ ।। ১৮১
প্রত্যাবর্তন ।। ১৮৩
বিজয়োৎসব ।। ১৮৩
চেঙ্গিজ খানের অবস্থান ।। ১৮৩
খাওয়ারিজম শাহের অনুভূতিশূন্যতা ।। ১৮৪
জুবি নৈয়ানের আক্রমণ ।। ১৮৫

খাওয়ারিজমি শক্তির বিভক্তি ।। ১৮৫
সাইহুনের পারে রক্তের মহোৎসব ।। ১৮৭
মুসলিমবিশ্বে দু-দিক থেকে আক্রমণ ।। ১৮৮

**অষ্টম অধ্যায় : সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী**

কুকন্দের মর্দে মুজাহিদ ।। ১৯১
মাঝদরিয়ায় রাস্তা ।। ১৯৩
আগ্নেয়াস্ত্র ।। ১৯৩
তৈমুর মালিকের পশ্চাদ্ধাবন ।। ১৯৫
তৈমুর মালিকের জিহাদি অগ্রযাত্রা ।। ১৯৬
আতরারের রণক্ষেত্র ।। ১৯৭
অফিসার কেরাছার গাদ্দারি ।। ১৯৯
নৈশ হামলা ।। ২০০
ইয়ালাল খান গ্রেফতার ।। ২০০

**নবম অধ্যায় : বোখারা ও সমরকন্দের পতন**

তাতার-বাহিনী বোখারা অভিমুখে ।। ২০৩
সমরকন্দে আতঙ্কিত খাওয়ারিজম শাহ ।। ২০৪
পলায়ন ।। ২০৪
বোখারা অবরোধ ।। ২০৬
মসজিদ-মাদরাসার শহর ।। ২০৬
মুসলিমদের আক্রমণ ও পরাজয় ।। ২০৭
শয়তানদের রাজত্ব ।। ২০৮
জামিউল কাবিরে চেঙ্গিজ খান ।। ২০৮
ইমামজাদা রোকনুদ্দীনের জবাব ।। ২১০
হুকুমনামা ।। ২১০
দুর্গে আক্রমণ ।। ২১১
জুলুমের দ্বিতীয় অধ্যায় ।। ২১১
আজাবের দিন ।। ২১২
রক্তের হোলিখেলা ।। ২১৩
সমরকন্দ ট্রাজেডি ।। ২১৪
প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ।। ২১৪
ত্রিমুখী আক্রমণ ।। ২১৫
সমরকন্দ অবরোধ : ইয়ালাল খান হত্যা ।। ২১৫
সমরকন্দের আমিরদের পরামর্শ ।। ২১৬
যুদ্ধের প্রথম দিন ।। ২১৭

দ্বিতীয় দিন ।। ২১৭
যুদ্ধের তৃতীয় দিন : গাদ্দারি ও পরাজয় ।। ২১৮
সমরকন্দে চেঙ্গিজ খান ।। ২১৯
রক্তের হোলিখেলা ।। ২২০
গাদ্দারির ফল ।। ২২০
খাওয়ারিজমিদের সহযোগী বাহিনীর ব্যর্থতা ।। ২২১
পাথরদিল খলিফা ও মুসলিম গভর্নর ।। ২২১
খাওয়ারিজমি মুসলিমদের হিজরত ।। ২২২

**দশম অধ্যায় : বিরানভূমির মুসাফির**

দক্ষিণের সফর ।। ২২৫
শাহজাদা জালালুদ্দীনের প্রচেষ্টা ।। ২২৫
দরবারি জ্যোতিষীদের পরামর্শ ।। ২২৬
আমুদরিয়ার পারে ।। ২২৬
পরামর্শসভা ।। ২২৭
হিন্দুস্থান অভিমুখে ।। ২২৭
শাহজাদা রোকনুদ্দীনের সফর ।। ২২৮
শাহজাদা জালালুদ্দীনের ভাষণ ।। ২২৮
বদরুদ্দীন আমিদের ষড়যন্ত্র ।। ২৩০
জিঘাংসা ।। ২৩২
পশ্চাদ্ধাবন ।। ২৩৪
নিশাপুরে খাওয়ারিজম শাহ ।। ২৩৫
শাহি হেরেমের হিজরত ।। ২৩৬
শাহজাদা রোকনুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ ।। ২৩৭
শাহি খাজানার সুরক্ষা ।। ২৩৮
ধ্বংসশালায় খাওয়ারিজম শাহ ।। ২৩৯
মাজেন্দ্রানে একদিন ।। ২৩৯
সমুদ্রপারের বস্তিতে আত্মগোপন ।। ২৪০
শাহি হেরেমের পরিণতি ।। ২৪৩

**একাদশ অধ্যায় : পশ্চিমা তাতারদের রক্তোন্মত্ততা**

শাহজাদা রোকনুদ্দীনের শাহাদাত ।। ২৪৭
রায় শহরে তাতার তাণ্ডব ।। ২৪৮
চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা : ভয়ানক পরিণাম ।। ২৪৯
হামাদানের গভর্নরের সন্ধি ।। ২৪৯
কাজবিন আক্রমণ ।। ২৫০

ইরবিল ট্রাজেডি ।। ২৫০
সারাও ।। ২৫১
তিবরিজবাসীর সন্ধিচুক্তি ।। ২৫১
বিধ্বস্ত বিলকান ।। ২৫১
মারাগেহ ।। ২৫১
ইউরোপ আক্রমণ ।। ২৫২
তাতার-আগ্রাসনের বছরপূর্তি : ইবনুল আসিরের মূল্যায়ন ।। ২৫২
ইউরোপ-রাশিয়ায় তাতারদের অগ্রযাত্রা ।। ২৫৫

**দ্বাদশ অধ্যায় : বিদায় হে পৃথিবীর মেহফিল**

মৃত্যুর পদধ্বনি ।। ২৫৭
সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যু : ইবনুল আসিরের মূল্যায়ন ।। ২৫৯
সুলতান আলাউদ্দীনের বিস্ময়কর জীবনচিত্র ।। ২৬০
এক বণিকের মুখে শাহের প্রশংসা : মুসলিমবিশ্বে তার অবস্থান ।। ২৬০
প্রথমকালের গল্প ।। ২৬১
মরেও তোমার মেলেনি খানিক স্বস্তি ।। ২৬২
ধর্মের প্রতি অনুরাগ ।। ২৬৩
মুওয়াফফিক বাগদাদির প্রতিক্রিয়া ।। ২৬৪
খাওয়ারিজম শাহের বয়স ।। ২৬৫
টুকরো টুকরো জীবনচিত্র ।। ২৬৬
পরাজয়ের কারণসমূহ ।। ২৬৬
কৈফিয়তের দায়ভার ।। ২৬৯
কারাকোরাম সম্পর্কিত একটি ভুল ধারণার অবসান ।। ২৭০
তুর্কি, তাতারি ও মোগল ।। ২৭১
তুর্কিস্তান ও বর্তমান তুরস্ক ।। ২৭৩

**ত্রয়োদশ অধ্যায় : শিক্ষাগৃহ আরগেঞ্চ**

সুলতান জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন ।। ২৭৫
পুরো মুসলিমবিশ্ব ও পুণ্যভূমির সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ ।। ২৭৬
আরগেঞ্চে সুলতান ।। ২৭৮
কঠিন মুহূর্ত ।। ২৭৯
তাতারদের সৈন্য পরিচালনা ।। ২৭৯
জিহাদ ঘোষণা ।। ২৭৯
চক্রান্তের জাল ।। ২৮০
রাজধানী ছাড়ার কাহিনি : এক কঠিন পরীক্ষা ।। ২৮১

কুতুবুদ্দীন আযলাকের হতাশা ও শহর থেকে পলায়ন ।। ২৮৩
আরগেঞ্চ অবরোধ ।। ২৮৪
আক্রমণ ।। ২৮৪
কামানের বিরল ব্যবহার ।। ২৮৫
তাতার-আগ্রাসনের পূর্বে শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার ভবিষ্যদ্বাণী ।। ২৮৬
শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের গল্প ।। ২৮৭
অগ্নি-বর্ষণ ও শহর ডুবিয়ে দেওয়ার এক বিরল পরিকল্পনা ।। ২৮৮
তাতার শাহজাদাদের মধ্যে অনৈক্য ।। ২৮৯
আরগেঞ্চ রণাঙ্গনে তুলি খান ।। ২৮৯
সম্মুখসমর ।। ২৯০
শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার শাহাদাত ।। ২৯১
গণহত্যা : রাজধানীর সলীল সমাধি ।। ২৯২
তাতারদের ক্ষয়ক্ষতির খেরোখাতা ।। ২৯৪
জোচিকে ভর্ৎসনা ।। ২৯৫

**চতুর্দশ অধ্যায় : নতুন শঙ্কা : নতুন সংকল্প**

উসতুওয়ার যুদ্ধ ।। ২৯৭
এখতিয়ার উদ্দীনের সাহায্য ।। ২৯৯
শাদইয়াখে অবস্থান ।। ৩০০
বিজলির বেগে ছুটে চলা ।। ৩০১
কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতানের শাহাদাত ।। ৩০১
সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদের দাওয়াত প্রভাব ।। ৩০৩
অতর্কিত আক্রমণের কাহিনি ।। ৩০৪
দিকে দিকে আজ জাগিয়া উঠেছে জিহাদি ইনকিলাব ।। ৩০৫
প্রচণ্ড সংঘর্ষ ।। ৩০৬
সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধপ্রস্তুতি ।। ৩০৬
নিশাপুরের গল্প ।। ৩০৭
তাতার আগ্রসনের নতুন ধারা ।। ৩০৯
বিধ্বস্ত নাসা ।। ৩০৯
চেঙ্গিজ খানের অস্থিরতা : তুলি খানের যাত্রা ।। ৩১১
নিশাপুরে কিফাচার নৈয়ানের আক্রমণ ।। ৩১১
বিধ্বস্ত তুস ও সাব্জেভর ।। ৩১২
কিফাচার নৈয়ানের মৃত্যুতে চেঙ্গিজ খানের ক্রোধ ।। ৩১২

তুলি খানের নিশাপুর আক্রমণ ।। ৩১৩
শায়েখ ফরিদুদ্দীন আত্তারের শাহাদাত ।। ৩১৫
বিরানভূমির ইয়াকুত পাথর মার্ভ ।। ৩১৫
সংঘর্ষ-সংঘাত ।। ৩১৬
এক হাজার তাতার বাহাদুরের মৃত্যু ।। ৩১৬
অবরোধ : তুলি খানের ধূর্ততা ।। ৩১৬
গণহত্যা ।। ৩১৯
দুর্ভাগা শহরের বারবার ধ্বংস হওয়ার গল্প ।। ৩২০
হামাদানের জিহাদ ।। ৩২১
হামাদানবাসীর অস্থিরতা ।। ৩২২
হাকিমের সঙ্গে আলোচনাপর্ব ।। ৩২২
হামাদানের ফকিহ্ সাহেবের জিহাদের ডাক শহরবাসীর ঐকমত্য ।। ৩২৩
যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ।। ৩২৪
অবরোধ ।। ৩২৫
যুদ্ধের প্রথম দিন ।। ৩২৬
যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ।। ৩২৬
তাতারদের শহর দখল ।। ৩২৮
শহিদদের সংখ্যা : অতিরঞ্জন কিংবা বাস্তবতা ।। ৩২৮

**পঞ্চদশ অধ্যায় : পুণ্যভূমি আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র**

হেরাতের যুদ্ধ ।। ৩৩৩
মুহাদ্দিস বাযযাযের শাহাদাত ।। ৩৩৬
কাজি ওয়াহিদুদ্দীনের বিস্ময়কর ঘটনা ।। ৩৩৬
সুলতানের আফগানিস্তান রওনা ।। ৩৩৮
যুযানবাসীর নির্লজ্জতা ।। ৩৩৯
হজরত খিজির আ. এর সুসংবাদ : গায়েবি ইলহাম ।। ৩৪১
চেঙ্গিজ খানের অগ্রযাত্রা ।। ৩৪১
বিধ্বস্ত বলখ ।। ৩৪১
ফারিয়াব ও যুযান ।। ৩৪২
তালকান অবরোধ ।। ৩৪২
গরাযওয়ান দুর্গ ।। ৩৪৩
বাৎসরিক শিকার-খেলা ।। ৩৪৪
জিহাদের স্মরণীয় ইতিহাস ।। ৩৪৪

কালিয়ুন দুর্গ ।। ৩৪৫
এশয়ার ও ফেওয়ার দুর্গ ।। ৩৪৬
সাইফরোদ দুর্গ ।। ৩৪৭
ফিরোজকুহ ।। ৩৪৯
তুলক দুর্গ ।। ৩৫০
জিহাদভূমিতে সুলতান জালালুদ্দীন ।। ৩৫০
কান্দাহারযুদ্ধ : শানদার বিজয় ।। ৩৫১
গজনির জিহাদি মারকাজ ।। ৩৫৩
মুজাহিদদের ছাউনি ।। ৩৫৪
সুলতানের বিবাহ ।। ৩৫৪
তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রা ।। ৩৫৪
সুলতানের বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ।। ৩৫৫
গজনির যুদ্ধ ।। ৩৫৫
গজনিবাসীর অবস্থা ।। ৩৫৮
গজনি যুদ্ধে জয়ের প্রভাব ।। ৩৫৮
হেরাতবাসীর জাগরণ ।। ৩৫৮
চেঙ্গিজ খানের ক্রোধান্ধতা ।। ৩৫৯
হেরাতবাসীর ভেতর গণহত্যা ।। ৩৫৯
হেরাতের গণহত্যা থেকে ইমাম রাজির পরিবারের হেফাজত ।। ৩৬১
খোরাসানে দ্বিতীয়বার গণহত্যা ।। ৩৬১
সুলতান জালালুদ্দীনের চ্যালেঞ্জ ।। ৩৬৩
কাবুলের দিকে সুলতানের অগ্রযাত্রা : পারওয়ানে অবস্থান ।। ৩৬৩
ওয়ালিয়ান দুর্গের যুদ্ধ ।। ৩৬৪
তুলি খানের যাত্রা ।। ৩৬৫
ইসলামি বাহিনীর কাতারবন্দি ।। ৩৬৫
সুলতানের হেকমতপূর্ণ বিস্ময়কর পদক্ষেপ ।। ৩৬৬
যুদ্ধের নকশা ।। ৩৬৭
তাতারদের প্রতারণা ।। ৩৬৮
সুলতান জালালুদ্দীনের দৃঢ়তা ও স্থিরতা ।। ৩৬৯
পালটাপালটি যুদ্ধ ও বিজয় ।। ৩৬৯
বামিয়ান যুদ্ধ ।। ৩৭১
কিছু জরুরি আলোচনা ।। ৩৭১
এক আচানক বিজয় অথবা বিজয়ের ধারা ।। ৩৭৩

মার্কিন ঐতিহাসিকের ভুল বিবরণ ।। ৩৭৪

**ষষ্ঠদশ অধ্যায় : সিন্ধুতটের প্রলয়ংকরী যুদ্ধ**

মুসলিমবাহিনীর ভেতর ফাটল ।। ৩৭৯
শিক্ষা ।। ৩৮১
চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ ।। ৩৮২
অগ্রগামী দলের ধ্বংস-কথা ।। ৩৮৪
নৌকার খোঁজে ।। ৩৮৫
সুলতানের গায়রত ।। ৩৮৬
নিলাবের তট ।। ৩৮৭
সুলতানের সূক্ষ্ম সারিবদ্ধকরণ ।। ৩৮৮
নৌকা স্থালিয়ে দাও ।। ৩৮৯
যুদ্ধের শুরু : প্রথম দিন ।। ৩৯০
যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ।। ৩৯০
তৃতীয় দিন : নিষ্পত্তিমূলক লড়াই ।। ৩৯১
সুলতানের হেকমতপূর্ণ কর্মপন্থা ।। ৩৯২
যুদ্ধের শুরু ।। ৩৯৪
আমান মালিকের বীরত্ব ।। ৩৯৪
বাম বাহুর হালচিত্র ।। ৩৯৫
জীবন-মরণের বাজি ।। ৩৯৫
সুলতানের ভয়ানক আক্রমণ ।। ৩৯৭
মুখোমুখি : খাওয়ারিজমের শার্দূল ও গোবির ভল্লুক ।। ৩৯৮
চেঙ্গিজ খানের চাল ।। ৩৯৯
মুসলিমবাহিনীর বাম বাহুর পরাজয় ।। ৪০০
ছিঁড়ে গেছে যুদ্ধের সুতো ।। ৪০১
শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত চলবে জিহাদ ।। ৪০২
সুলতানের পুত্রের শাহাদাত ।। ৪০৪
চেঙ্গিজ খানের খায়েশ ।। ৪০৫
মৃত্যুর নগ্ননৃত্য ।। ৪০৬
মুজাহিদের অট্টহাসি ।। ৪০৭
চেঙ্গিজ খানের প্রশংসা ।। ৪০৯
সিন্ধুযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ।। ৪১১
নিলাব কোথায় বিদ্যমান ।। ৪১২

# পাঠপূর্ব পর্যালোচনা

সৃষ্টিলগ্ন থেকে সময়ের এক কঠিন চক্রাবর্তের ভেতর আটকা পড়ে আছে এই গ্রহ—পৃথিবী। তখন থেকে অদ্যাবধি একে-একে কেটে গেছে বহু শতাব্দী। ইতোমধ্যে মানবসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করেছে যুগ-বদলের করুণ কিছু অধ্যায়।

জগতের এক অমোঘ বিধানের নাম 'মানবের কর্মের প্রতিফল'। সকল যুগের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই বিধানেরই কিছু বাস্তব দৃশ্য আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি।

মানবজাতির উন্নতি-অবনতির ইতিহাস, বড় বড় রাজা-বাদশাহর প্রতিষ্ঠা ও পতনের উপাখ্যান, পৃথিবীর প্রাচীন সব মতবাদ কিংবা ধর্মভিত্তিক লড়াইয়ের বিজয়, সফলতা ও অগ্রগতির দাস্তান—সবকিছুই মহান আল্লাহর এই অমোঘ বিধানেরই প্রতিফলন; অবশ্যম্ভাবী বাস্তবায়ন।

## বনি ইসরাইলের দুই বিপ্লবের গল্প

কুরআন মাজিদে বনি ইসরাইলের উন্নয়ন ও অধঃপতনের বর্ণনা যে ভাষাভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, তা মূলত পৃথিবীবাসীকে উত্থান-পতনের এই ব্যাপারটি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রতি আহ্বান করে।

এই সম্প্রদায় যখন নাফরমানির সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা। তাদের ধ্বংসদূত হিসেবে বেবিলন হতে উদ্ভব ঘটেছিল নেবুচাদনেজারের, যে বাইতুল মাকদিস গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বনি ইসরাইলের আকাশ-ছোঁয়া অগ্রগতি মুহূর্তে করেছিল ভূলুণ্ঠিত।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

অতঃপর যখন ঐ দুটোর প্রথমটির ওয়াদা আসবে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার প্রচণ্ড শক্তিশালী বান্দাদের পাঠাব। তারা (শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমাদের) ঘরবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবে। এটা একটা কার্যকর ওয়াদা।

তারপর তাদের ভেতর আল্লাহ তায়ালা একের পর এক নবীদের পাঠালেন। তাদের দাওয়াতের বরকতে বনি ইসরাইলের মৃত আত্মায় পুনরায় সঞ্চার ঘটে জীবনের। ততদিনে পৃথিবীর উপর দিয়ে সময়ের দীর্ঘ এক ঝড় বয়ে গেছে। এরা ফের লাঞ্ছনার

খোলস থেকে বেরিয়ে মানবজাতির ভেতর নিজেদের নতুন অবস্থান পাকাপোক্ত করে ফেলল। কিন্তু এই উন্নতির ধারাও বেশিদূর গড়ায়নি। পুনরায় তাদের ভেতর বাসা বাঁধে কুফর, শিরক, প্রেরিত নবীদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, অন্ধ অহমিকা, জুলুম-নির্যাতন, ধোঁকাবাজি, বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন ও পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ। এইসব ভয়াবহ অপরাধ আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের কারণ হয়ে ওঠে এবং নেমে আসে মহা বিপর্যয়।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

তারপর যখন (ঐ দুটোর) দ্বিতীয়টির ওয়াদা আসবে, তখন (তাদের পাঠাব) যাতে তারা তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে, প্রথমবার যেভাবে প্রবেশ করেছিল সেভাবে মসজিদে প্রবেশ করে, এবং চড়াও হয়, সব তছনছ করে দেয়।

ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার দ্বিতীয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ঘটে ইউরোপিয়ান তিউতাস রোমির হামলার মধ্য দিয়ে। সে ইয়াহুদ বংশকে বিনাশ করে ফেলেছিল পুরোপুরি। বইয়ে দিয়েছিল গলগলে রক্তের বন্যা। আলকুদসের গায়ে প্রজ্বলিত করেছিল লেলিহান আগুন।

## উম্মাহর ইতিহাসে দুই মহা বিপর্যয়

বনি ইসরাইলের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু মাথায় রাখুন। কারণ, আমরা যদি এখন উম্মাহর বিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির ইতিহাস নিরিখ করে উঠি, বুঝব, মুসলিমজাতি যতদিন ইসলামকে জীবনের পরম পাওয়া ভেবেছে, মহান আল্লাহর একত্ব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও পরকালের প্রতি রেখেছে গভীর বিশ্বাস, জিহাদ হয়ে উঠেছে তাদের জীবনের প্রিয় কর্মব্যস্ততা ব্যস্ততা, দুনিয়ার জীবন তাদের চোখে তুচ্ছাতিতুচ্ছ—ততদিনই তারা আল্লাহর জমিনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ছড়ি ঘোরাতে পেরেছে। তাদের তখন প্রধান টার্গেট ছিল আল্লাহর জমিনে তার বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন। তাদের পুরো জীবনটাই যেন ছিল দাওয়াতে ইসলামের প্রোজ্জ্বল নমুনা। তাদের রাত কেটেছে প্রলম্বিত সিজদায়, রবের ভয়ে প্রকম্পিত কান্নায়। দিন কেটেছে মরুভূমির ভেতর তাজাদম ঘোড়ার পিঠে, খুনরাঙা চটচটে রণাঙ্গনে।

চীন থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত দেশের বাসিন্দারা তখন মুসলিম খলিফাদের ট্যাক্স প্রদান করে বসবাস করত। খলিফাদের চরিত্রও ছিল মহৎ, পৃথিবীবাসীর কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। তাদের যাপিত জীবনের তাহজিব-তামাদ্দুনের ছোঁয়ায় সভ্যতা-বিবর্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ-আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলে উন্নতির জোয়ার উঠেছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাদের থেকে শিখেছে বৈশ্বিক নিয়ম-নীতি। পৃথিবীর সব সম্প্রদায় তাদের সামনে ফলভর্তি গাছের ডালের মতো ঝুঁকে পড়ত বিনয়ে। তাদের সংস্পর্শেই মুখর হয়ে উঠেছিল উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিটি অঙ্গন।

কিন্তু একদিন, সেসব সোনালি দিনের অবসান ঘটেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে উম্মাহর ঊর্ধ্বগতির ধারা। কারণ, সময়ের ঘূর্ণনে আল্লাহ ও তার রাসুলের উষ্ণ ভালোবাসা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। একদম শীতল, যেন-বা এক টুকরো বরফ, যে বরফের স্পর্শে মিইয়ে গেছে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ, বেড়ে গেছে বস্তুপূজা, দুনিয়ার মহব্বত ও আয়েশি জীবনযাপনের লোভ বাসা বেঁধেছে বুকের ভেতর।

ধীরে-ধীরে পার্থিবতার মোহে এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেছে তারা, অনন্ত আখেরাতের খানিক ভাবনাও আর থাকেনি। ফলে, প্রকাশ্য দিবালোকে চলতে লাগল আল্লাহর নাফরমানি। মৃত্যু বড়ই অপছন্দনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। আল্লাহর পথে মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ়পদ মুজাহিদের সংখ্যা দিন-দিন কমে যেতে লাগল। এমনকি, ইসলামে জিহাদ বলে যে একটি ফরজ বিধান আছে, সে-কথাও ভুলে বসল বেমালুম। উম্মাহ ক্রমান্বয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকল। পিঁপড়ের জমাটবদ্ধ অবস্থানে একফোঁটা জল ফেললে যেমন দল ভেঙে ছুটতে থাকে এদিক-ওদিক, ঠিক তেমন। বেড়ে গেল পরনিন্দা, চোগলখোরি।

হিজরি চতুর্দশ শতকে ইসলামি খেলাফতের প্রাণকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছিল। ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব নতুন-নতুন স্বাধীন রাজ্যের, নতুন নতুন স্বাধীন শাসকের আবির্ভাব ঘটছিল। ফলে, আরও দ্রুততর হচ্ছিল উম্মাহর নিম্নগামিতার গতি।

ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে মুসলিমবিশ্ব পারস্পরিক বিক্ষিপ্ততার চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বিপরীতে কাফের শাসকরা শুরু করেছিল মুসলিমবিশ্বকে টুকরো-টুকরো করে ফেলার গোপন পাঁয়তারা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উম্মাহর 'ঐক্যবদ্ধতা' বোঝাতে গিয়ে চমৎকার একটি উপমা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, টুকরো-টুকরো ইট-সুড়কি নিয়ে যেভাবে গড়ে ওঠে একটি মজবুত সুরম্য প্রাসাদ, হে মুসলমান, তোমাদের সবল-দুর্বল প্রতিটি সদস্য মিলেও ঠিক তেমনই একটি জমাটবদ্ধ সঙ্ঘ, অজেয় এক ঐক্য।

কিন্তু ষষ্ঠ শতকে এসে এই সঙ্ঘবদ্ধ উম্মাহর বিধ্বস্ততার যাবতীয় কার্যকারণ সম্পূর্ণতা পেয়ে গেল। তখন কেবল ধপ করে ভূগর্ভে ধসে পড়বার অপেক্ষা।

কর্মফলের সেই অকাট্য বিধানের বাস্তবায়ন সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্যই সমান। এজন্য শেষনবীর উম্মত তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালিয়াতের পরও স্রষ্টার এই বিধানের বাইরে যেতে পারেনি। বনি ইসরাইলের মতো এই উম্মাহর ভেতরেও (ইসলামের শুরুর জামানা থেকে হাল আমল নাগাদ) দু-দুবার সেই কানুনে ইলাহির প্রকাশ ঘটেছে। বয়ে গেছে এমনকিছু আগ্রাসন, যা মুসলিমবিশ্বের কোমর পুরোপুরি দুমড়ে দিয়েছে। পুরো মুসলিমবিশ্ব বাঁচা-মরার টানাটানির ভেতর পড়ে গেছে।

তখন হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ, সপ্তম শতাব্দীর শুরু। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ঘটে গেল ভয়াবহ প্রথম দুর্ঘটনাটি। মুসলিমদের পর্বতপ্রমাণ আলস্যের

দরুন নেমে এল আল্লাহর নিয়মের এক শক্ত আঘাত। সেই আঘাতে যেন পিঠজুড়ে হয়ে গেল দগদগে ঘা, উঠে আর দাঁড়াতে পারছিল না অবস্থা।

শুরু হল মোঙ্গলিয়ার তাতার পিশাচদের নারকীয় আগ্রাসন, যা একদম ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল পুরো মুসলিমবিশ্বের অস্তিত্ব। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকাংশ বিরান করে ফেলেছিল—যেন সারি-সারি পোড়োবাড়ি, সর্বত্র লেগে আছে ধ্বংস-চিহ্ন, মাঝেমাঝে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উঠছে ধোঁয়া, বোঝা যায়—এই ক'দিন আগেও এখানে ছিল মনুষ্যজাতির বসবাস।

তখনই দিগন্তে শেষ লালিমাটুকু ছড়িয়ে ডুবে গিয়েছিল আব্বাসি খেলাফতের সূর্য। এ ছিল ইসলামের ইতিহাসে ঘটে-যাওয়া প্রথম বিপর্যয়।

তারপর দ্বিতীয়টি হল পৃথিবীজুড়ে পাশ্চাত্য জাতির কর্তৃত্ব ও নগ্ন হস্তক্ষেপ। হিজরি দ্বাদশ শতকে (খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে) মূলত এর শুরু।

এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে মুসলিমবিশ্বের কোনো অঞ্চলই বাঁচতে পারেনি। ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকা, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, কখনওবা একযোগে মুসলিমবিশ্বের গলায় দাসত্বের বেড়ি পরিয়েছে। পাশ্চাত্যের এই শক্ত থাবা মুসলিমবিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্রে যেমন পড়েছে, মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মতাদর্শে তার চেয়ে প্রকটভাবে লেগেছে আঘাত।

আমাদের ভারত উপমহাদেশসহ সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে ওদের গোলামির শেকল পরে আছে। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অধিকসংখ্যক মুসলমান ধর্ম, মাজহাব, পূর্বসূরির ইলমের উত্তরাধিকার, জীবনধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি—সবকিছু খুইয়ে ফেলেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ এদের কাছে হয়ে উঠেছে গর্বের বিষয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মুসলমান হয়ে গেছে কাফের হামলাকারীদের গোলাম। খুইয়ে ফেলেছে রক্তের সেই পুরোনো উষ্ণতা ও জাতীয়-মর্যাদাবোধ। 'জিহাদ' শব্দ ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ ভুলে গেছে বেমালুম। এ যেন চির অপরিচিত একটা শব্দ।

কাফেরদের এই কর্তৃত্ব এখনও পুরোপুরিভাবে বিরাজমান। বর্তমানে তা বরং আরও তুঙ্গে। আফগানিস্তান ও ইরাক ধ্বংসের পর এই শকুনদের চোখ পড়ল পাকিস্তানে। পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস শতাব্দীকাল ধরে আজও তাদের কবজায়। আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা ও মসজিদে নববিও এদের সার্বক্ষণিক অবরোধের ভেতর রয়েছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

একবিংশ শতাব্দী এখন।

প্রযুক্তির এ স্বর্ণযুগে বসে, মুসলিমবিশ্বে নেমে-আসা মোঙ্গলিয়ানদের সেই ভয়াবহ আগ্রাসন যদি একটু নিরিখ করে দেখি, আমাদের এই রক্তাক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় যে, মোঙ্গলিয়ানদের সেই প্রবল ঝড়ে ছয়শ বছরের প্রাচীন

ইসলামি ঐতিহ্য তুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল দিগ্বিদিক। মুসলিমদের শক্তি এতটাই লোপ পেয়েছিল যে, পৃথিবীতে তারা পরিণত হয়েছিল এক সংখ্যালঘু জাতিতে।

মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমের শহরগুলো ছাড়া কোনো অঞ্চলই তাতার হামলার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। তাতারদের কদম যেখানে পড়েনি, সেখানকার লোকজনও তাদের নাম শুনে ভয়ে কাঁপত রীতিমতো। সবার মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাতাররা হুট করে যেকোনো সময় এসে পড়তে পারে, আজ না-হয় কাল, তারা ঠিকই আমাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে, খেলবে রক্তের হোলি।

সেই দুর্দিনে, উম্মাহর যাবতীয় বিত্ত-বৈভব, আজিমুশশান সমস্ত মসজিদ-মাদরাসা, বিরল-দুর্লভ ও অনবদ্য গ্রন্থে ভরপুর সমস্ত ইসলামি কুতুবখানা এবং মারেফাতের অমৃত সুধার সুরক্ষিত রত্নভান্ডার দীনের সব খানকাহ—কোনো কিছুই বাদ পড়েনি, সেই ঝড়ের কবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল সব। মুসলিমবিশ্বের মহান ইমাম, ফকিহ-মুহাদ্দিস ও সুফি, ধর্মবিশ্লেষক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি-সাহিত্যিক সকলেই সেই সয়লাবের অভ্রভেদী ঢেউয়ের ভেতর তলিয়ে গিয়েছিলেন।

নামজাদা বাদশাহ, শাহজাদা, সিপাহসালার ও মুজাহিদ-কমান্ডাররা ছিলেন এই তুফানের প্রধান টার্গেট। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ দুর্গ ও বসতিপূর্ণ শহর পৃথিবীর মানচিত্র থেকে একদম মুছে গিয়েছিল। দেড় কোটির মতো মানুষকে হত্যা করা হল। ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেল শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বংশের পর বংশ, গোত্রের পর গোত্র। মাত্র কয়েক বছরে এমনভাবে পালটে গেল পৃথিবীর মানচিত্র, যা ধারণা করে ওঠাও দুঃসাধ্য।

ইতিহাসের এমনতরো হাজারও বিরানভূমি ও ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা দেওয়ার পর শেষমেশ সে-যুগের এক ঐতিহাসিক একেবারে তব্দা খেয়ে যান। একথা লিখতে বাধ্য হন—এই দুর্ঘটনা এতই ভয়াবহ ছিল যে, ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে বারবার আমার মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন ও বিমূঢ় হয়ে পড়ছিল। কয়েক বছর নাগাদ এই দুর্যোগের কথা আমি উল্লেখই করতে চাইনি। এ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও একদম পছন্দ হতো না আমার। এখনও সেই দ্বিধার ভেতরেই আছি—লিখব কি লিখব না। বলি, ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যুর ঘোষণা দিতে কার-বা সাহস হয়! কে আছে, সেই ভয়াবহ দুর্যোগের কথা কলমের আঁচড়ে-আঁচড়ে লিখতে হিম্মত দেখায়!

হায়, আমার মা যদি আমাকে হারিয়ে ফেলতেন! দুর্যোগের পূর্বেই যদি মৃত্যু হয়ে যেত আমার! পৃথিবীর বুক থেকে আমি চিরকালের জন্য খসে যেতাম!

কিন্তু বন্ধুরা ধরে বসলেন। ইতিহাস লিখতে রাজি করালেন। তবু আমার মন ছিল দোদুল্যমান। একবার মনে হল, না-লেখাতেও তো বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এমন ভয়ানক বিপর্যয় ও বিপন্নতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর মেলে না। এর একটি উপমা খুঁজতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে বিগত সমস্ত দিনরাত।

পুরো পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিল এই বিপর্যয়ের ঘন কালো মেঘ। কিন্তু অন্য কাউকে না, বিশেষত শুধু মুসলমানদের। যদি কেউ দাবি করে, আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীতে এমন মুসিবত আর আসেনি, তা নিশ্চিত সত্য। কারণ ইতিহাসে এই ঘটনার কাছাকাছি, কিংবা কাছাকাছি না-হলেও কোনোভাবে মিল রয়েছে, তেমন কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর বড় বড় কিছু বিপর্যয়ের কথা লিখতে গিয়ে ইতিহাসবিদরা বলেন– বাইতুল মুকাদ্দাসে বনি ইসরাইলের উপর নেবুচাদনেজারের হত্যাকাণ্ড একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবু সেটাকে নিতান্ত সাধারণই বলা যায়। কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাসের হত্যাকাণ্ড সপ্তম শতকের মুসলিম সাম্রাজ্যগুলির হত্যাযজ্ঞের তুলনায় কিছুই না, হতভাগা তাতাররা ধ্বংস করে দিয়েছিল যেগুলো। প্রত্যেকটি শহরই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কয়েক গুণ বড় ছিল। এমনকি, তাতারদের হাতে যারা মারা গেছে, বনি ইসরাইলের নিহতদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অত্যল্প। শুধু একেকটি শহরের নিহতের সংখ্যাই বনি ইসরাইলের নিহতদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ছিল। হয়তো পৃথিবীবাসী মহাপ্রলয় পর্যন্ত এ বিপর্যয়ের অনুরূপ কিছু আর দেখে উঠবে না কখনও; কেয়ামতপূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসলীলা ব্যতীত। কারণ, ইয়াজুজ-মাজুজের তাণ্ডব হবে আরও ভয়াবহ।

বাকি আছে দাজ্জাল। সেও তো যখন আসবে, তার অনুসারীদের জীবিত ছেড়ে দেবে, শুধু অস্বীকারকারীদের হত্যা করবে। কিন্তু হিংস্র তাতাররা তো কাউকেই জীবিত রাখেনি। সম্মুখে যাকেই পেয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে। নারী-পুরুষ থেকে নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা পর্যন্ত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছে। এমনকি, গর্ভবতী নারীদের পেট কেটে অপুষ্ট-অপরিণত ভ্রূণ বের করে ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে ফেলেছে।

ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সে ছিল এমন এক ভয়াবহ ফেতনা, যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়েছিল পৃথিবীর আনাচ-কানাচে। শহরগুলোর উপর দিয়ে গম্ভীর হাঁকডাকপূর্ণ মেঘপুঞ্জের মতো বয়ে গিয়েছিল।[১০]

তাতার হামলার সময় পর্যটক ইয়াকুত হামাবি খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের মার্ভ শহরে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়কার ধ্বংসচিত্রগুলো বড় বেদনাপূর্ণ ভাষায় ছোট্ট একটি পত্রে তুলে ধরেছেন তিনি। লিখেছেন, 'খাওয়ারিজমের এই সবুজ-শ্যামল-নিরাপদ শহরগুলোতে আল্লাহর অবাধ্য একদল হিংস্র পশু ঢুকে পড়েছে। এখানে এখন শাসন চলছে দুশমনদের। এরা সমস্ত পাড়া-মহল্লা মানচিত্র থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে, যেভাবে পত্র থেকে মুছে ফেলা হয় ভুল হরফ।

---

[১০] তারিখুল ক'মিল লি ইবনিল আসির, ৭/৫৭০

রাজ্যের সর্বত্র পড়ে রয়েছে অজস্র মরদেহ। বাতাসে ভাসছে পচা লাশের গন্ধ। লাশের উপর উড়ে উড়ে কাক-শকুনের পাল নামছে একের পর এক। এখানে কেবল ভল্লুকের গা-ছমছমে আওয়াজ শোনা যায় এখন। রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে লু-হাওয়ার প্রচণ্ড ঘূর্ণি। কী ভয়াবহ, কী নির্মম!

আমরা দেখছি, ধ্বংসপ্রাপ্ত কাউকে কেউ-একজন সমবেদনা জানাতে গেছে, আর কী আশ্চর্য, কাছে গিয়ে ওই সমব্যথী লোকটিও নাক-মুখ কুঁচকে হিংস্র হয়ে উঠছে। ভয়ানক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে এ রাজ্য।

এই নারকীয় তাণ্ডবলীলায় ইবলিসও হয়তো আজ গাইছে মর্সিয়া-গীতি :

كأن لم يكن فيها اوانس كالدمى❁واقيال ملكٍ فى بسالتهم امد

فمن حاتم فى جوده وابن مامة ❁ ومن احنف ان عد حلم ومن سعد

تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا ❁لنا عبرة تدمى الحشا و لمن بعد

এখানে মূর্তির মতো নিটোল-মায়াবী নারীকুল আর দুঃসাহসী রাজা-বাদশাহরা কখনোই যেন বসবাস করেননি। আজ দানশীলতায় হাতেম তাই ও ইবনে উমামার সেই মহান কর্ম কে আঞ্জাম দেবে, বলো? সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতায় আহনাফ আর সাআদ হবে কে? যুগ-বদলের হাওয়া তাদের এমনভাবে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, আমাদের ও পরবর্তীদের জন্য তারা হয়েছে স্রেফ মিথে পরিণত। এ বড় ব্যথাজাগানিয়া উপাখ্যান, যা কলিজা বিদীর্ণ করে দেয়।

সে-যুগের এক সাহিত্যিক তাতারদের আগ্রাসন দেখে বলেছিলেন,

آمدند و گرفتند و سوختند و بردند و رفتند

ওরা এল, ধ্বংস করল, জ্বালিয়ে গেল, লুটে নিল, তারপর ছুটে গেল।

তার এই বাক্যটি প্রবাদের মতো মানুষের মুখে মুখে ফিরত। এই একটি বাক্যে তাতার-আগ্রাসনের পুরো দাস্তান লুকিয়ে আছে।

## তাতার হামলার ব্যাপক প্রসিদ্ধি : উত্থাপিত একটি প্রশ্ন

মুসলিমবিশ্বের এই বিপর্যয়ের কথা পুরো পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি, যে কখনও ওলটায়নি ইতিহাসের পাতা, ইতিহাসপাঠের সাথে সামান্য সম্পর্কও নেই যার, সেও এই তাতার হামলার কাহিনি কখনও-না-কখনও শুনেছে।

এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, চেঙ্গিজ খান ও হালাকু খানের নাম শোনামাত্র যার চোখে ভয়াবহ রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞের একটি চিত্র ভেসে ওঠে না। এই নির্দয়-পাষণ্ড হিংস্র পশুগুলি মুসলিম উম্মাহর ভেতর এমন ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, যার শোহরত একদম তাওয়াতুর বা নিশ্চিত সত্যের পর্যায়ে চলে গেছে।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পাশবিকতা ও হিংস্রতার নগ্ন উপাখ্যান মুসলিমদের বড় দুঃখী করে তোলে। ভাবতেই যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মন। এক্ষেত্রে ইতিহাসের গভীর-মনস্ক পাঠকদের মনে খচখচ করে একটি প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেননি কোনো মুসলিম মর্দে মুজাহিদ? সেই নাজুক পরিস্থিতিতে, রাসুলের কোনো উম্মত الجهاد ماض الى يوم القيامة (জিহাদ জারি থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত) এর প্রোজ্জ্বল নমুনা হয়ে নেমে আসেননি মুষ্টিবদ্ধ লড়াইয়ে?

ইতিহাসের সাধারণ একজন পাঠকেরও উত্তর মেলে—না, কেউ পারেননি।

এর কারণ, এ-বিষয়ক অল্পকিছু গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ ব্যতীত বাকিসব লেখা হয়েছে পরবর্তী জামানায়। এবং খানিকটা থ্রিলারধর্মী হওয়ার কারণে পাঠকদের ব্যাপক সমাদর কুড়িয়েছে।

সেই গ্রন্থগুলোতে, তাতারদের ৪২ বছরব্যাপী আক্রমণের বিরুদ্ধে সুবিন্যস্ত কোনো জিহাদি অগ্রযাত্রার কথা উঠে আসেনি। সাধারণ পাঠকেরা গ্রন্থগুলো এমন প্রতিক্রিয়া নিয়ে পড়ে ওঠেন যে, ৬৫৮ হিজরিতে আইনজালুত শহরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধের পূর্বে তাতাররা আর কখনোই পরাজয়ের মুখ দেখেনি। ইতিহাসের এই অগভীর-বিলুপ্ত-বিকৃত ঘটনাবলি যদি কেউ পড়ে ওঠে, মুসলিমদের দুর্বলতা, পরাজয় ও বিপন্নতার একটি ছবি স্বাভাবিকভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠে তার মনের আয়নায়। এবং একপ্রকার হীনম্মন্যতাবোধের সৃষ্টি হয় ভেতরে-ভেতরে। মূলত, ইসলামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব দুশমন মুসলিমদের ভেতর সূক্ষ্মভাবে এই অনুভূতিরই সঞ্চার ঘটাতে চায় সবসময়।

## মুসলিম শাসকদের গাফলতি : সুলতান জালালুদ্দীনের অবদান

কোনো সন্দেহ নেই, সেকালের অনেক রাজ্যের বাদশাহ দুশমনের আক্রমণের মুখে অসহায়ভাবে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। নিজেদের গলায় নিজেরাই পরিয়েছিলেন অপদার্থতার লাগাম। জিহাদি জজবা ভুলে মুসলমান তখন চুপচাপ সেই হত্যাযজ্ঞের তামাশা দেখেছে। দরদি আলেমদের রচনাবলি আজও মুসলিম শাসকদের এই অযোগ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

শায়েখ নাজমুদ্দীন রাজি রহ. সে-যুগের এক মহান বুজুর্গ। তার অনবদ্য গ্রন্থ মিরসাদুল ইবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এই অভিশপ্ত তাতাররা মুসলিমদের যে ভয়ানক ফেতনায় ফেলেছিল, সেসব ধারণ করার মতো কোনো শব্দ আমার কলমে ফুটবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের দায়িত্ব প্রধানত আমাদের শাসকদের। বর্ণিত হয়েছে,

الامير راع على رعيته وهو مسؤول عنهم

আমির তার প্রজাদের নিরাপত্তাবিধান করবে। প্রজাদের অধিকার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

# খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

# খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আলমগীর মুরতাজা

নাশাত

প্রকাশক
নাশাত পাবলিকেশন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৫১১৮০৮৯০০, ০১৭১২২৯৮৯৪১

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০২০; রবিউস সানি, ১৪৪২

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ

সর্বস্বত্ব © নাশাত

মূল্য : ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র

# সূচিপত্র

## প্রথম অধ্যায় : হিন্দুস্থানের মাটিতে

সময়ের ডাক।। ১৭
হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক হালচাল।। ১৯
সিন্ধুনদের পারে।। ১৯
নিরস্ত্র সিপাহি।। ২১
হিন্দু রাজাদের সাথে জিহাদ।। ২২
প্রথম যুদ্ধ।। ২২
দ্বিতীয় যুদ্ধ।। ২৪
হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ।। ২৪
সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন।। ২৫
কুদরতি বাধা।। ২৫
প্রত্যাবর্তন।। ২৬
শিক্ষার উপাদান।। ২৭
দিল্লির বাদশাহর দোরগোড়ায়।। ২৭
ইলতুৎমিশের ফিরতি জবাব।।২৮
পাঞ্জাব ও সিন্ধুতীরের তাজা বিজয়।। ২৯
গিয়াসুদ্দীনের গড়ে-ওঠা নতুন রাজত্ব।। ৩০
কিবাছার অপকর্ম।। ৩১
কিবাছার সাথে লড়াই।। ৩৩
লাহোর, উচ ও সিদিস্তান বিজয়।। ৩৫
দেবল অঞ্চলে।। ৩৬
একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ।। ৩৬
নতুন বিজয়ের ধারা।। ৩৭
সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে মনোমালিন্যের কারণ।। ৩৭
খানসারের যুদ্ধক্ষেত্র।। ৩৮
সন্ধি স্থাপন ও মনোমালিন্য দূরীকরণ।। ৩৯
খোরাসান ও ইরাকে তাতারদের নয়া লুটতরাজ।। ৩৯
দিল্লির রাজদরবারের প্রশস্ততা।। ৪০
ফেরা।। ৪১
সফরে আপতিত বিপদ।। ৪৪

## দ্বিতীয় অধ্যায় : নবনির্মিত প্রতিরক্ষাকেন্দ্র

বুরাক হাজিব।। ৪৭
বুরাক হাজিবকে শায়েস্তা।। ৪৮
কৌশল কৌশল খেলা।। ৪৯
নতুন বন্ধু।। ৫০
ইস্পাহানে...।। ৫২
গিয়াসুদ্দীনের কুধারণা।। ৫২
গিয়াসুদ্দীনের সাথে লড়াই।। ৫৩
মাথার উপর ঝলকে ওঠে উন্নয়নের তারা।। ৫৪
খুজিস্তানের যুদ্ধাভিযান।। ৫৫
বৈশ্বিক চালচিত্র।। ৫৫
উম্মাহর ঐক্যভাবনা : সুলতানের চিন্তাদর্শন।। ৫৭
খলিফার দরবারে সুলতানের দূতের রওনা : একটি ব্যর্থতার গল্প।। ৫৮
বাগদাদ বাহিনীর আক্রমণ।। ৫৯
সুলতানের বার্তা।। ৫৯
যুদ্ধের শুরু।। ৫৯
যুদ্ধের পরিণতি।। ৬০
খলিফার হতভম্বতা।। ৬১
বাকুবা ও দাকুকা দখল।। ৬১
ইরবিলের হাকিমের সাথে লড়াই এবং সন্ধিচুক্তি।। ৬২
নয়া সংকল্প।। ৬২
মারাগেহ দখল।। ৬৩
মুসলিম শাসকদের সাথে যোগসূত্রতার শুরু।। ৬৩
আলাউদ্দীন কায়কোবাদের সাথে ঐক্য।। ৬৩
সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের চিঠি।। ৬৪
সুলতান আলাউদ্দীন কায়কোবাদের জবাব।। ৬৬
সুলতান জালালুদ্দীনের নামে আলাউদ্দীন কায়কোবাদের চিঠি।।৬৬
শামের শাসক আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের সাথে সম্পর্ক।। ৬৮
সুলতানের প্রতি মুয়াজ্জমের মৌলিক বিশ্বাস।। ৬৯
খলিফা নাসির সম্পর্কে মুয়াজ্জমের কাছে সুলতানের চিঠি।। ৬৯
আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের উদ্দেশ্যমালা।। ৭০
এক নতুন কেতনা ও এর প্রতিকার।। ৭২
তিবরিজ অভিযান।। ৭৩
বেগম বিনতে তুগরুলের চিঠি।। ৭৪

বিজয়ীবেশে তিবরিজে প্রবেশ।। ৭৬
মহাপ্রাচীর।। ৭৭
পৃথিবী নকশা : ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ।। ৭৮

**তৃতীয় অধ্যায় : জর্জিয়ার বিজয়সমূহ**

এক নয়া চ্যালেঞ্জ।। ৮১
জর্জিয়ান কারা?।। ৮২
শালুহের ঔদ্ধত্য।। ৮৩
আক্রমণের প্রস্তুতি।।।। ৮৪
যুদ্ধের আহ্বান।।।। ৮৪
সুলতানের প্রজ্ঞাদীপ্ত পরিকল্পনা।। ৮৫
জর্জিয়ানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ।। ৮৬
সুলতানের চাল।। ৮৮
শালুহ ও ইওয়ানি।। ৯০
সাম্রাজ্যের উজিরের চিঠি।। ৯১
তিবরিজে প্রত্যাবর্তন।। ৯২
মাহে রমজানের কর্মব্যস্ততা।। ৯২
বেগম বিনতে তুগরুলের সঙ্গে বিবাহ।। ৯৩
গনজা বিজয়।। ৯৩
খলিফা নাসিরের ইনতেকাল।। ৯৩
নতুন খলিফা।। ৯৫
খলিফা জাহিরের বন্ধুত্বের চিঠি।। ৯৫
জর্জিয়ার পথে দ্বিতীয় যাত্রা।। ৯৬
জর্জিয়ার সম্রাজ্ঞীর সাথে আলোচনা।। ৯৬
চক্রান্তের জাল।। ৯৭
চক্রান্তের বিস্তার।। ৯৮
মুনাফিকদের পরিণাম।। ৯৯
তুমুল যুদ্ধ।। ১০০
জর্জিয়ানদের কবলে সুলতান জালালুদ্দীন।।১০১
সুলতানের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।। ১০৩
তিফলিস বিজয়।। ১০৪
আমার যদি হতো কভু ফিদিয়া নেবার শখ।। ১০৬
আল্লামা ইবনুল আসিরের প্রশংসা-বচন।। ১০৭
বাগদাদের দূতের জিহাদি জজবা।। ১০৮

## চতুর্থ অধ্যায় : সম্মিলিত প্রতিরোধ-শক্তির বিধ্বস্ততা

খলিফাতুল মুসলিমিনের ক্রোধ।। ১১১
আল-মালিকুল আশরাফের সাথে দ্বন্দ্ব।। ১১২
সুলতানের থেকে আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের বিচ্ছিন্নতা।। ১১২
কয়েকটি ঘটনা ও যুদ্ধাভিযানের কথা।। ১১৪
আকস্মিক অভিযান।। ১১৪
খলিফা জাহেরের মৃত্যু।। ১১৪
জর্জিয়ায় সুলতানের তৃতীয় আক্রমণ।। ১১৫
তুর্কমানি দস্যুদলকে শায়েস্তা।। ১১৫
বাহাদুরির এক আজিব ঘটনা।। ১১৬
মালিক খামুশের তোহফা।। ১১৬
বিধ্বস্ত তিফলিস।। ১১৬
জর্জিয়ানদের সাথে আরো কয়েকটি যুদ্ধ।। ১১৭

## পঞ্চম অধ্যায় : বাতেনিদের (ইসমাইলিয়া) সাথে জিহাদ

বাতেনিদের নতুন হাঙ্গামা।। ১২১
খাওয়ারিজমি আমিরের সাহসিকতা।। ১২২
বাতেনি দূতকে কঠিন জবাব।। ১২২
আওর খান নিশাপুরির শাহাদাত।। ১২৩
নতুন বৈঠক।। ১২৪
উজিরে আজমের ভয় ও কাপুরুষতা।। ১২৪
কঠিন সাজা।। ১২৫
জিহাদের ঘোষণা।। ১২৫
খঞ্জর ও তলোয়ার।। ১২৬
ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের প্রশংসমালা।। ১২৭

## ষষ্ঠ অধ্যায় : তাতারদের সাথে জিহাদের দ্বিতীয় পর্ব

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের দ্বিতীয় দফা আগ্রাসন।। ১২৯
তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রা।। ১৩০
তিবরিজের বিদ্রোহ।। ১৩০
রায় নগরীর প্রথম যুদ্ধ।। ১৩১
কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা : কায়কোবাদের সাহায্য।। ১৩৪
একটি অশুভ ধারণা।। ১৩৫
আল-মালিকুল মুয়াজ্জমের মৃত্যু।। ১৩৬
রায় নগরীর দ্বিতীয় যুদ্ধ।। ১৩৬

ইস্পাহানে সুলতান।। ১৩৭
জিহাদের প্রস্তুতি।। ১৩৯
জিহাদের সাধারণ ঘোষণা।। ১৪০
অতর্কিত আক্রমণকারীদের কাণ্ডকীর্তি।। ১৪১
যুদ্ধের ময়দানে..।। ১৪১
গিয়াসুদ্দীনের গাদ্দারি।। ১৪১
রণাঙ্গনের নকশা।। ১৪২
শত্রুপক্ষের পরাজয়।। ১৪৩
বদলে গেছে দৃশ্যপট।। ১৪৫
ঘেরাও দিয়েছে ভেঙে।। ১৪৬
যুদ্ধের বিস্ময়কর পরিণতি।। ১৪৭
ইসলামি বাহিনীর অজানা অবস্থা।। ১৪৮
আবু বকর ইবনে সাআদের প্রত্যাবর্তন।। ১৪৯
আতাবেগ আলাউদ্দৌলার কোরবানি।। ১৪৯
ইস্পাহান অবরোধ।। ১৫০
বাতেনিদের উচ্ছ্বাস।। ১৫০
সুলতানের বর্তমান অবস্থা।। ১৫১
ইস্পাহানবাসীকে সুলতানের চিঠি।। ১৫১
ঈদগাহে সুলতান জালালুদ্দীনের আগমন।। ১৫২
শেষযুদ্ধ, স্পষ্ট বিজয়।। ১৫৩
চেঙ্গিজ খানের স্থলাভিষিক্তের অবমুক্তি।। ১৫৪
তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এসব যুদ্ধের ফল।। ১৫৪

**সপ্তম অধ্যায় : সম্মিলিত বাহিনীর সাথে জিহাদ**

অন্যান রাজ্যের সাথে জর্জিয়ানদের ঐক্য।। ১৫৭
সুলতানের যুদ্ধবিষয়ক পরামর্শসভা।। ১৫৮
জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য সাধারণ ঘোষণা।। ১৫৯
সুলতান জালালুদ্দীনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা।। ১৬০
আরো একটি কৌশল।। ১৬১
আছে কি কোনো মল্লযোদ্ধা।। ১৬১
আল্লাহর সাহায্য অবতরণ।। ১৬৪

**অষ্টম অধ্যায় : আপন লোকের শত্রুতা**

আল-মালিকুল আদিলের সাথে যুদ্ধ।। ১৬৭
কায়কোবাদের প্রস্তাব।। ১৬৭
খিলাতে সুলতান জালালুদ্দীনের সিদ্ধান্ত-নিরূপক যুদ্ধ।। ১৬৮

বিগড়ে যাওয়া অবস্থা।। ১৮০
সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ।। ১৮৪
সুলতান ইয়াসি চমনে...।। ১৮৬
অগ্রবর্তী দলের আঘাত।। ১৮৭
রোকনুদ্দীনের অভিমত।। ১৮৭
কায়কোবাদকে আল-মালিকুল আশরাফের দেওয়া প্রবোধ।। ১৮৯
বাড়তি আক্রমণ।। ১৮৯
যুদ্ধ এভানো যায়নি।। ১৮৯
শেষযুদ্ধ।। ১৮৯
সুলতান জালালুদ্দীনের অশ্রু।। ১৯০
যুদ্ধের শুরু।। ১৯১
তাকদিরের ফায়সালা।। ১৯২
স্পষ্ট পরাজয়।। ১৯৩
নিরুপায় সুলতান।। ১৯৪
সন্ধি।। ১৯৫
হিন্দুস্থানের দখলীকৃত রাজ্যে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্ব।। ১৯৫
আমির-উজিরদের মাঝে বিদ্রোহের লক্ষণ।। ১৯৭
তিবরিজ ও গনজায় চক্রান্ত।। ১৯৭

**নবম অধ্যায় : নিভে গেল আশার প্রদীপ**

তাতারদের অগ্রযাত্রা।। ১৯৯
আলামুতের হাকিমের চক্রান্ত।। ২০০
সীমান্তে তাতারদের উৎপাত।। ২০০
মুজাহিদের ডাক।। ২০৩
সৈন্যদলের একরোখা মনোভাব।। ২০৪
সুলতানের আবাসস্থলে তাতারদের হামলা।। ২০৫
তাতারদের অতর্কিত আক্রমণ।। ২০৭
মাহানে অবস্থান।। ২০৮
শারফুল মুলকের কুকর্ম, খারাপ পরিণতি।। ২০৮
গাদ্দারদের তিবরিজ দখল।। ২১০
বসন্তের শুরু, তাতারদের আগমন।। ২১১
এক তাতার কয়েদিকে জিজ্ঞাসাবাদ।। ২১১
শেষপ্রচেষ্টা।। ২১২
গনজার বিদ্রোহ।। ২১৩

শাসকদের নতুন জিহাদের ডাক।। ২১৪
আল-মালিকুল আশরাফের ধৃষ্টতা।। ২১৫
মুসলিম শাসকদেরকে তাতারদের ধমকি।। ২১৮
ভবিষ্যতের ফয়সালা।। ২১৯
দূতদের প্রত্যাবর্তন।। ২২০
ভয়ংকর স্বপ্ন।। ২২১
আতর খানের গাফলতি।। ২২২
আয়াদ-এর শাসকের প্রতারণা।। ২২৪
তাতারদের অবরোধের ভেতর।। ২২৫
শেষধাওয়া।। ২২৭
মনজিল হ্যাঁয় কাহাঁ তেরি?।। ২৩০
আতর খানের অসাধুতা ও পরিণতি।। ২৩০
মায়াফারকিনের উপকণ্ঠে রাত্রিযাপন।। ২৩১
আতর খানের গাদ্দারি ও পরিণতি।। ২৩১
মুসাফির হেঁটে যায় একা।।২৩২
সুলতানের পরিণতি : বিপরীতমুখী বিভিন্ন অভিমত।। ২৩৪
দ্বিতীয় অভিমত।। ২৩৮

**দশম অধ্যায় : জালালুদ্দীনের তিরোধানের পর মুসলিমবিশ্বের বিপন্ন অবস্থা**

সুলতান জালালুদ্দীনের পর...।। ২৪৩
সুলতানের সঙ্গীদের পরিণতি।। ২৪৭
বাগদাদ-ট্রাজেডি।। ২৪৮

**একাদশ অধ্যায় : জীবন ও অবদান**

বীরত্ব।। ২৫৩
পরীক্ষা ও উৎসর্গের সাতকাহন।। ২৫৪
হিম্মত।। ২৫৭
সৈনিকসুলভ বৈশিষ্ট্য।। ২৫৭
রাষ্ট্র পরিচালনার ধরন।। ২৬১
নতুনভাবে শহর আবাদ।। ২৬২
শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির আয়োজন, মাদরাসা ও খানকার আলোচনা।। ২৬২
ন্যায়বিচার।। ২৬৩
খরচের ধরন।। ২৬৫
ক্ষমাশীলতা।। ২৬৬
অকৃত্রিমতা ও সাদাসিধে মনোভাব।। ২৬৮

অনর্থ কর্ম থেকে বিরত থাকা : কল্যাণকর কাজে যুক্ত হওয়া।। ২৭০
ভুল সংশোধনের চেষ্টা।। ২৭১
বড়দের আনুগত্য।। ২৭৩
খলিফাকে দেওয়া সম্মান।। ২৭৫
কাজের দ্রুততা।। ২৭৬
পরিণামদর্শিতা, সতর্কতা ও সন্দেহ।। ২৭৭
সত্তাগত কিছু গুণাবলি : তোষামোদি ও চাটুকারিতার প্রতি ঘৃণা।। ২৭৮
কোমলপ্রাণতা।। ২৭৮
সুন্নি হানাফি মুসলমান।। ২৭৯
চরিত্র, দৈহিক সৌষ্ঠব ও অভ্যাস-প্রকৃতির কিছু ঝলক।। ২৮০
মানকাবিরাতি শব্দের প্রকৃত অর্থ।। ২৮২
সুলতান জালালুদ্দীনকে নিয়ে ইতিহাসবিদদের প্রশংসা।। ২৮৩
বিরোধীদের প্রতিক্রিয়া।। ২৮৪

**দ্বাদশ অধ্যায় : সুলতান জালালুদ্দীনের আপন-পর**

সুলতানের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণ শ্রেণি।। ২৮৭
দাদি তুর্কান খাতুন।। ২৮৭
সুলতান জালালুদ্দীনের ভ্রাতৃবৃন্দ।। ২৮৮
গিয়াসুদ্দীন।। ২৮৮
সুলতানের ভগ্নীগণ।। ২৯৩
তৃতীয় বোন : শাহজাদি খান সুলতান।। ২৯৩
সুলতানের পত্নীগণ।। ২৯৬
সুলতানের স্ত্রীদের পরিণতি।। ৩০১
সুলতানের সন্তানসন্ততি।। ৩০২
তুর্কান খাতুন বিনতে সুলতান জালালুদ্দীন।। ৩০২
সুলতানের জানবাজ বিশ্বস্ত সাথি তৈমুর মালিক।। ৩০৩
জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুক।। ৩০৫
আওর খান আলি নিশাপুরি।। ৩০৬
মালিক নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ।। ৩০৭
আমান মালিক।। ৩০৭
আতাবেগ আবু বকর বিন সাআদ।। ৩০৮
আওর খান।। ৩০৯
সুলতানের দরবারে আলেম ও সাহিত্যিকগণ।। ৩১০
শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবি।। ৩১০
আল্লামা সাক্কাকি।। ৩১২

শামসুল মুলক শিহাবুদ্দীন আলপ।। ৩১৪
কামালুদ্দীন ইসমাইল।। ৩১৪
মুনশি নুরুদ্দীন।। ৩১৭
ফাতাহনামা।। ৩১৮
মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ তরজুমান ও বিবি মুনজিমা।। ৩২০
তাজুদ্দীন কালিজ।। ৩২১
বদরুদ্দীন হেলাল।। ৩২২
নাসিরুদ্দীন কাশাতমুর।। ৩২২
কিছু অজ্ঞাত গোলাম।। ৩২২
সুলতানের গাদ্দারশ্রেণি।। ৩২৩
কিতলুগ খান।। ৩২৩
সাইফুদ্দীন আগরাক খলজি ও তার অনুগত বাহিনী।। ৩২৩
বুরাক হাজিব।। ৩২৬
শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন।। ৩২৬
আতর খান।। ৩২৭
শারফুল মুলক খাজা জাহাঁ।। ৩২৭
ওয়াফা মালিক।। ৩৩১

**ত্রয়োদশ অধ্যায় : আল-মালিকুল মুজাফফর সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজ**

টুকরো-টুকরো বিক্ষিপ্ত ইতিহাস।। ৩৩৩
তোর বাপ কে?।। ৩৩৪
আল-মালিকুস সালিহের খেদমতে...।। ৩৩৫
বরকতপূর্ণ স্বপ্ন।। ৩৩৫
নিষ্পাপ প্রতিশ্রুতি।। ৩৩৬
দাস থেকে বাদশাহ হয়ে ওঠার কাহিনি।। ৩৩৬
সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজের সিংহাসনারোহণ।। ৩৩৮
কিতবুগা নৈয়ানের রক্তপাত।। ৩৩৮
তাতারদের দামেশক দখল।। ৩৪১
যুদ্ধের দামামা।। ৩৪১
আইনজালুতের যুদ্ধ।। ৩৪২

**চতুর্দশ অধ্যায় : কষ্টিপাথরে সুলতান জালালুদ্দীন**

সুলতান জালালুদ্দীনকে নিরীক্ষণের প্রেক্ষাপট।। ৩৪৯
ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী, স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন ও অপরিণামদর্শী।। ৩৫২
খলিফার সাথে শত্রুতা : আপাতটুকুর বাস্তবতা।। ৩৫৩

অন্যান্য শাসকের সাথে শত্রুতা : বাস্তবতার আলোকপাত।। ৩৫৫
'জুলুম, নিপীড়ন ও কষ্টদান'র অপবাদ : স্পষ্ট জবাব।। ৩৫৬
খিলাত ট্রাজেডি।। ৩৫৭
'বালকের সাথে কামভাব চরিতার্থ করা'র জঘন্য অপবাদ ও তার জবাব।। ৩৫৯
মদ্যপান ও নৃত্যগানের অপবাদ : স্পষ্ট জবাব।। ৩৬০
ধোঁকাবাজি ও ওয়াদাখেলাফি : আসল বাস্তবতা।। ৩৬৪
সুলতান জালালুদ্দীন কি একজন ব্যর্থ নেতা ছিলেন?।। ৩৬৫
সুলতানের সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হবার কারণ।। ৩৬৬
অনৈচ্ছিক কার্যকারণ।। ৩৬৬
ইচ্ছাগত কার্যকারণ।। ৩৭০
কোনো স্থলাভিষিক্ত না-থাকা।। ৩৭৭
একটি ভুল প্রতিক্রিয়া ও তার খণ্ডন।। ৩৭৭

**পরিশিষ্ট**

ইতিহাসের শিক্ষা।। ৩৮২
হৃদয়ের আকুতি।। ৩৯৩
একনজরে ঘটনাপ্রবাহ।। ৩৯৫
গ্রন্থপঞ্জি।। ৩৯৭

প্রথম অধ্যায়

# হিন্দুস্থানের মাটিতে

## সময়ের ডাক

সুলতান জালালুদ্দীন এখন হিন্দুস্থানের মাটিতে অবস্থান করছেন। এই হিন্দ-ভূমিতে তার বংশগত আত্মীয়তা রয়েছে। তার মা ছিলেন হিন্দুস্থানি নারী। আর এই মুলুকের সীমান্তেই জীবনের পিঞ্জিরা ভেঙে উড়ে গেছেন সেই মা। তারই পুত্রধন আজ মাতুলালয়ের দেশে খানিক আশ্রয় খুঁজতে লেগেছে।

এই উদ্বাস্তু দিনগুলিতে, সিন্ধুর তীর-সংলগ্ন বনজঙ্গলে অবস্থানরত সুলতান জালালুদ্দীন লুণ্ঠিত কাফেলার এক সরদারের মতো তার জীবনে ঘটে-যাওয়া এই দুর্ঘটনা নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে উঠলেন। এইসব দুর্ঘটনায় স্রেফ দু-বছরের ভেতর পালটে গিয়েছিল পুরো মুসলিমবিশ্বের মানচিত্র। দু-বছর পূর্বে যে খানদানের সাম্রাজ্য ইরানের উত্তরদিকের আল-বুরজ পর্বতশ্রেণি থেকে পেশোয়ার, সাইহুন-নদী থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আজ সেই প্রভাব-প্রতিপত্তির জানাজা ঘটে গেছে। আরগেঞ্চ থেকে সিন্ধুতট পর্যন্ত সমস্ত ইসলামি শহর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দক্ষিণে রাজ্যের সর্বশেষ সীমান্ত থেকেও বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন খাওয়ারিজমের এই শেষ সম্রাট।

সেদিন সুলতানের খুব মনে হতে লাগল পিতার কথা, যার মাহাত্ম্য ও আতঙ্কে পানি হয়ে যেত দুনিয়ার শাসকদের ক্ষমতার দম্ভ। আজ তার সমাধি সেই সুদূর উপত্যকার ভেতর মানবজাতির জন্য শিক্ষার এক উপকরণ হয়ে পড়ে রয়েছে। মনে পড়তে লাগল সেই দাদির কথা, যার গাম্ভীর্য ও প্রতিপত্তিতে তুর্কমান সরদারদের ভেতর কাঁপুনি শুরু হয়ে যেত। সুলতান ভাবছিলেন, আজ সেই দাদি নিষ্ঠুর তাতারদের মুঠোর ভেতর তড়পাচ্ছেন। প্রিয় বোন সেই খান সুলতান, যে তার ভাইকে খুব মহব্বত করত, তার কথাও খুব মনে পড়ছিল। এই খান সুলতান ছিল সুলতানের সকল দুঃখকষ্টের ভাগীদার। আজ সে কোনো গোঁয়ার তাতার শাহজাদার হাতে বন্দি। কুতুবুদ্দীন, আক সুলতান ও রোকনুদ্দীন, এরা সকলেই তার প্রিয় ভাইবেরাদর। সবাই সেই কবেই শহিদ হয়ে গেছে। মা, বিবি, সন্তান, নিকটাত্মীয় ও প্রিয়ভাজনেরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোরবান হয়ে গেছেন পদে পদে সঙ্গে-থাকা জানবাজ সিপাহসালারগণ। জীবনের প্রথমভাগে নিরাপদ স্বস্তির মধ্যে থাকা সমস্ত মুসলিম জনসাধারণের মস্তকও নেমে গেছে ধড় থেকে। স্থানে-স্থানে মাথার খুলির সুউচ্চ মিনার আকাশ স্পর্শ করে আছে। কিন্তু এদের সবার এই কোরবানিতে উম্মাহর জন্য কী অর্জিত হয়েছে? স্রেফ এক পরিপূর্ণ পরাজয়। শত্রুর লাঞ্ছনাকর গোলামি।

এখন কি তবে আমার সমস্ত মেহনত-মুজাহাদায় সফলতার কোনো আশা রাখা যাবে না? এ পরাজয়কে উম্মতে মুসলিমার ধ্বংস ও পতনের সুনিশ্চিত তাকদির ভেবে ছুড়ে ফেলতে হবে হাতের তলোয়ার?

এইসব প্রশ্ন জট পাকাতে লাগল সুলতানের মাথার ভেতর। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে নতুন সংকল্পের উপজাত হিসেবে তার মনে জেগে উঠল একটা উত্তর—না, তা কখনো হতে পারে না।

উম্মাহর নেতৃবৃন্দ যদি হয়ে উঠতেন বিপুল সাহসী, অলসতার ঘুম ভেঙে মুসলিম শাসকগণ তরবারি ধারণ করে হয়ে উঠতেন যদি মুজাহিদদের শক্তিশালী বাহু, তা হলে নিশ্চিত এরকম মহাবিপর্যয় থেকে বেঁচে ওঠা যেত। কিন্তু সহস্র আফসোস, খাওয়ারিজমের (কম করে হলেও) এক কোটি মুসলমানের গণহত্যাও এই পাথর মনের শাসকদের ভেতর কোনো চোট লাগাতে পারেনি। সহমর্মিতা জাগাতে পারেনি।

বাগদাদের খলিফা, রোমের সুলতান, মিশরের শাসক, শাহে দিল্লি ও শামের শাসকসহ ক্ষমতাধর সমস্ত রাজা-বাদশাহ দেখছিলেন দুশমনের মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়েছে খাওয়ারিজমি বাহিনী ও সাধারণ জনতা। তবু তাদের কেউ সেই মজলুমদের সহযোগিতায় এগিয়ে যাননি। কেউ-ই মনে করেননি তাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে। অথচ তখন তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ও মজলুম খাওয়ারিজমি জনতার প্রতিরক্ষায় তলোয়ার ওঠানো শরিয়াহর দৃষ্টিতে আশপাশের সমস্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের উপর ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীন এমন অবস্থায় তলোয়ার উঠিয়েছিলেন, যখন খাওয়ারিজমের তরবারি ধারণের শক্ত বাহু কেটে পড়ে গেছে। কিন্তু নিরুপায় শক্তিহীনতার কালে সুলতানের প্রচেষ্টা-মুজাহাদার কারণে মহান আল্লাহ তার সাহায্যের সব দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ফলে তাতাররা অনেকগুলো রণাঙ্গনে পরাজিত হয়ে ভেগেছিল। কিন্তু বড় আফসোসের কথা—হয়তো জয় নাহয় পরাজয়, এমনতরো সিদ্ধান্ত নিরূপণ করে-দেওয়া চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বেই ভেঙে গেছে সুলতানের তলোয়ার। আমিরদের গাদ্দারি তার পরাজয়ের কারণ বনেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে পূর্বের এইসব বিষয় ভেবেচিন্তে সুলতান জালালুদ্দীন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন—সামগ্রিকভাবে আমরা যেমন কর্ম সম্পাদন করেছি, সেই কর্মের ফল হিসেবে আমাদের উপর ঘটে চলেছে আসমানি ফয়সালা। তবে, যদি একটিবার বাগদাদ ও সিরিয়া পর্যন্ত সকল শাসক মুসলিম উম্মাহর সাহায্য ও প্রতিরক্ষায় আমাকে সঙ্গ দেবেন বলে রাজি হয়ে যান, তা হলে উম্মাহর উদ্দীপ্ত সিপাহিদের একত্র করে তাতারদের থেকে বদলা নেওয়া এখনো কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। একসঙ্গে সবাই জেগে উঠলে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে ফেলা সম্ভব।

সুলতান খুব গভীরভাবে অনুভব করে উঠলেন যে, উম্মাহর শহিদদের প্রত্যেকটি রক্তকণিকা তার নিকট প্রতিশোধ কামনা করছে। ভেতর থেকে তাকে বিপুলভাবে নাড়িয়ে তুলছে। সুলতানের মনে তখন জেগে ওঠে নতুন সংকল্প—না, এই শহিদদের একফোঁটা রক্তও বৃথা যেতে দেওয়া যায় না। শূন্যহস্ত সুলতান ফের বুকভরা সাহস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি চাচ্ছিলেন—হিন্দুস্থানের মাটিতে জিহাদি অভিযানের নতুন এক কেন্দ্র গড়ে তুলবেন।

## হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক হালচাল

সুলতান জালালুদ্দীনের হিন্দুস্থান প্রবেশের বিস্তারিত কাহিনি পড়বার আগে, সে-কালের হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক হালচিত্র কী ছিল, তাতে খানিক নজর বুলিয়ে নেওয়া সমীচীন মনে করছি।

হিন্দ-বিজেতা সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরির শাহাদাতের পর, ঘুর থেকে আরম্ভ করে বাঙলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তার সেই বিশাল সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে পড়েছিল। ৬০২ হিজরির ১৮ জিলকদ (জুন, ১২০৬) মঙ্গলবারে শিহাবুদ্দীনের নায়েব কুতুবুদ্দীন একজন স্বাধীন শাসকরূপে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। হিন্দুস্থানে তিনিই প্রথম স্বাধীন ইসলামি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

কুতুবুদ্দীন আইবেকের মৃত্যুর পর, ৬০৬ হিজরিতে (১২১০ খ্রিষ্টাব্দ) তার আজাদকৃত দাস ও জামাতা শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ হন দিল্লির বাদশাহ। খোরাসানে তখন ঘুরি সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট নায়েবরা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের নিকট অবনতি স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু তারপর খুব বেশি দিন কাটেনি—তাতারদের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। ৬১৮ হিজরিতে সুলতান জালালুদ্দীন যখন সিন্ধুনদী পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানের মাটিতে পা রাখলেন, তখন সিন্ধুর পূর্বতীর-সংলগ্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল দিল্লির আধিপত্যমুক্ত ছোট-ছোট হিন্দু-রাজ্য। সিন্ধুতে শাসন ছিল নাসিরুদ্দীন কিবাছার, আর দিল্লির ক্ষমতা ছিল ইলতুৎমিশের।[১]

## সিন্ধুনদের পারে

সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুতীরের পূর্বদিকের গা-ছমছমে গহীন অরণ্যে দুই দিন কাটালেন। তার যে-সমস্ত বিক্ষিপ্ত সহযোদ্ধা নদী পেরোতে সক্ষম হয়েছিল, এবং পারে উঠে পাগলের মতো সুলতানকে খুঁজে ফিরছিল, তারা এক-দুজন করে সুলতানের সঙ্গে এসে শামিল হতে লাগল। এভাবে ধীরে-ধীরে তাদের সংখ্যা ৫০ হয়ে গেল।[২]

---

[১] তাবাকাতে নাসিরি, ১৯/৪৭৪-৪৮৬, ২০/৪৯০, ২১/৫২০; তারিখে মিল্লাত, ৩/৩৩৪-৩৫২; খাওয়ারিজমশহি, ১৪৮;

[২] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪২, ১৪৩;

নাসাবির বর্ণনা-মোতাবেক—তাদের মধ্য থেকে তিনজনের নাম সাদুদ্দীন আলি, কালাব্রাস বাহাদুর ও কাবকাহ।

তাফসিরে কাবির গ্রন্থে হাফেজ যাহাবি কাজি ইবনে ওয়াসেলের সূত্রে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সেই বর্ণনা থেকে জানা যায়—সুলতানের সঙ্গে এসে মিলিত-হওয়া বহু সিপাহি কোনোক্রমে নৌকা জোগাড় করে নদীর এ-পারে এসে উঠেছিল।

নাসাবির বর্ণনা অনুযায়ী—সুলতানের অসংখ্য সিপাহি তার দেখাদেখি পেছন থেকে নদীতে ঝাঁপ মেরেছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নদীর উত্তাল ঢেউ কয়েক মাইল দূরের তটে নিয়ে আছড়ে ফেলেছিল; মাছের পেটের ভেতরের আহার উগরে দেবার মতো। সুলতান বেঁচে আছেন কিনা তারা জানত না। তারা উন্মাদের মতো ছুটছিল এদিক-ওদিক। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ, ভাগ্যক্রমে শুকনো পাতার স্তর পড়ে-যাওয়া সেই গহীন জঙ্গলের ভেতর আচমকা পেয়ে গিয়েছিল সুলতানকে।

তাদের ভেতর জিয়াউল মুলক আবিজ আন-নাসাবিও ছিলেন। নদীতে সুলতানের লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তিনিও ঝাঁপ মেরেছিলেন। নিজের গল্প তিনি নিজেই বলেছেন—আমি পানিতে লাফিয়ে পড়লাম। অথচ আমি জানতামই না সাঁতার কী জিনিস। আমি ক্রমাগত হাবুডুবু খেতে লাগলাম। ডুবেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি বাতাসে ফোলানো এক চামড়ার মশকে ভর করে গা ঠেলে ঠেলে সাঁতরাচ্ছে একটি বাচ্চা। আমি আনাড়ির মতো হাত-পা ছুড়ে ছুড়ে তার মশক ধরবার চেষ্টা করলাম। তখন কান পর্যন্ত আমার পুরো দেহ পানির ভেতর। এই মুহূর্তে বাচ্চাটা বলে উঠল—শোনো, বাঁচতে চাইলে আমার কাছ থেকে মশক একেবারে ছিনিয়ে নিও না। বরং আমার সাথে মশকে তুমিও ঝুলে পড়ো। কিনারায় পৌঁছে দেব। তারপর সে আমাকে নদীর কিনারায় নিয়ে এল এবং গায়েব হয়ে গেল। আমি তাকে অস্থির হয়ে খুঁজতে আরম্ভ করলাম। আমাদের খুব কমসংখ্যক সিপাহিই জীবিত এ-পারে আসতে পেরেছিল। এই অল্পসংখ্যকের ভেতরেও সে একদম নজরে পড়েনি। হুলস্থুল বেশি হলে তা-ও একটা কথা ছিল।[৩]

এটাকে গায়েবি মদদ ছাড়া কী বলা যায়? নদীর এই তেজি ধারাপ্রবাহের ভেতর একজন দক্ষ সাঁতারুকেও একাকী খুব মুশকিলের সাথে সাঁতরাতে হয়। হতভম্ব হতে হয়—পিচ্চি একটা বাচ্চা কীভাবে আরেকজনকে সহায়তা করে নিরাপদে পারে নিয়ে তুলল!

যা হোক, বেঁচে পারে-ওঠাদের এই ছোট্ট দলটি প্রিয় রাহনুমাকে তাদের মাঝে জীবিত পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। অপরিসীম ক্লান্তি ও শক্তিহীনতা সত্ত্বেও এই দুঃসাহসিক সিপাহিরা ফের নতুন করে কঠিন সব পরীক্ষা ও বিপদের পাহাড়

---

[৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৬১

গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দেশে নবায়ন করতে লাগল নিজেদের সংকল্প। মুজাহিদদের বিপুল উদ্দীপনার এই মুহূর্তটা ছিল এমন—তখন তাদের হাতে সওয়ারি কিংবা অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা, নিজেদের সতর ঢাকবার উপযুক্ত কাপড় ও আহারের দু-তিনটে লোকমাও সহজলভ্য ছিল না। তার উপর অনেকের শরীরেই তখন বসে গেছে দগদগে ঘা। তাদের চিকিৎসারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

এর ভেতর একসময় জামালযারদ নামের এক লোক গায়েবি মদদগার হয়ে সুলতানের দরবারে এসে হাজির হল। এই লোক ছিল সুলতানের একজন বিত্তবান অফিসার। চেঙ্গিজ খানের সাথে সুলতানের যুদ্ধ বাধার পূর্বেই ধনসম্পত্তি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু সে যখন সুলতানের পরাজয় ও সিন্ধুপারে তার আগমনের খবর জানল, খুব চিন্তান্বিত হয়ে উঠল তার মন। প্রিয় কায়েদের প্রয়োজনের কথা আন্দাজ করে একটি নৌকায় বিপুল পরিমাণ খোরাকি, কাপড় ও বিভিন্ন জাতের দ্রব্য নিয়ে সুলতানের খেদমতে এসে উপস্থিত হল। এতে করে সুলতানের সঙ্গীদের প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য ও সতর ঢাকার কিছু পোশাক মিলে গিয়েছিল। খুশি হয়ে সুলতান জালালুদ্দীন জামালের পূর্বের অপরাধই শুধু ক্ষমা করেননি; বরং তাকে নৈকট্যভাজন গণ্য করে এখতিয়ার উদ্দীন উপাধিও প্রদান করেন।

বিস্ময়জাগানিয়া এই ঘটনা وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকি বান্দাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন, যা তার কল্পনায়ও আসে না) এরই বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্যের জ্বলন্ত প্রমাণ।

## নিরস্ত্র সিপাহি

সুলতান দ্রুত তাতার-ফেতনার মোকাবেলা করার জন্য দিল্লির বাদশাহ সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের কাছে সাহায্য তলবের উদ্দেশে দিল্লি যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রাস্তায় হঠাৎ অজানা আশঙ্কার মুখোমুখি হয়ে যেতে পারতেন। তাই ভাবলেন—ইলতুৎমিশের কাছে যাবার আগে এইরকম অজানা বিপদগুলোর মোকাবেলা করে-ওঠার মতো ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাখা জরুরি। কারণ, তাতারদের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা তখনও রয়ে গেছে। তা ছাড়া হিন্দুস্থানের শাসকরাও কম শঙ্কাজনক ছিল না।

সুলতান আশপাশের এলাকা ও পরিপ্রেক্ষিত যাচাইয়ের জন্য গুপ্তচর হিসেবে কিছু মুজাহিদকে অগ্রে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে গেলেন—কাছেই হিন্দু সিপাহিদের একটি দল আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করছে। সুলতান এই সংবাদটি এক অপ্রত্যাশিত নেয়ামত ভেবে সিপাহিদের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও সওয়ারি লাভের পরিকল্পনা আঁটলেন। কয়েকজন সৈন্যকে আদেশ দিলেন—জঙ্গল থেকে বৃক্ষের কিছু শাখা কেটে আনো।

সঙ্গে সঙ্গে হুকুম বাস্তবায়িত হল। তারপর যখন রাতের অন্ধকারে চারপাশ ছেয়ে গেল, এই লাঠিয়াল মুজাহিদরা চুপি চুপি হিন্দু বাহিনীর কাছে পৌঁছে তাদের উপর সরাসরি আক্রমণ করে বসল। এই সফল গেরিলাযুদ্ধে মারা গেল অনেক হিন্দু সেনা। অবশিষ্টরা অস্ত্রশস্ত্র, মহিষ-সহ অন্যান্য রসদপত্র ফেলে পালিয়ে গেল। গনিমতের এই মাল মুজাহিদদের জন্য গায়েবি মদদ থেকেও কম ছিল না।[৪]

## হিন্দু রাজাদের সাথে জিহাদ

সিন্ধুনদের পারে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটে গেছে, সেই যুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীন পরাজিত হয়ে নদী পেরিয়ে এ-পারে চলে এসেছেন—একথা সিন্ধুতীরের হিন্দু রাজারা পূর্বেই শুনতে পেয়েছিল। সুলতানের বীরত্ব ও সাহসিকতার শোহরত দূরদূরান্তের সাম্রাজ্যগুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য হিন্দুস্থানের সীমান্তে সুলতান জালালুদ্দীনের আগমনে হিন্দু রাজারা ভারী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাদের এই শঙ্কা ছিল দুই তরফা। একদিকে ভাবছিল—আগত দিনে হিন্দুস্থানে এই মর্দে মুজাহিদ যদি ফের রচনা করে বসে গজনবি ও ঘুরির সেই জ্বলন্ত ইতিহাস। অন্যদিকে এ নিয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে যে—সুলতান জালালুদ্দীনকে ধাওয়া করতে এসে তাতাররা যদি আমাদের এই হিন্দুস্থানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলে!

বুকের ভেতর এইসব চাপা শঙ্কা জেঁকে বসায় হিন্দু রাজারা সুলতান জালালুদ্দীনের সঙ্গে মোকাবেলা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। ফলে, সুলতান জালালুদ্দীন ও স্থানীয় হিন্দু রাজাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল যুদ্ধের এক লম্বা সিলসিলা। প্রত্যেকটি যুদ্ধে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তিনি হিন্দু রাজাদের বহুগুণ বড় ও জমাটবদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করতে লাগলেন।

## প্রথম যুদ্ধ

রানা চিত্রা নামে একজন হিন্দু রাজা ছিল। তার রাজ্যের উপকণ্ঠেই ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের বর্তমান অবস্থান। এই রাজা এক হাজার পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুলতান জালালুদ্দীনের সন্ধানে।

সুলতানের জন্য এবারকার মুহূর্তগুলো হয়ে উঠেছিল কঠিন পরীক্ষার। কারণ, তার সহযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল এমন যে, মুহূর্তের ভেতর আঙুলে তাদের গুনে ফেলা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার সিন্ধুর যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেই আঘাতের জ্বলন্ত ব্যথায় অবিরাম কাতরে চলছিল এখনো। অধিকাংশের নিকট অস্ত্রও ছিল না। এই অবস্থায় এক পেশাদার ও সুবিন্যস্ত বাহিনীর সাথে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করে-ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

---

[৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬০; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; তারিখে কাবির যাহাবি, ৬২/৬১৮;

নিরুপায় সুলতান অতি সত্বর বর্তমান অবস্থানস্থল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সহযোদ্ধাদের আদেশ দিলেন—আহতদের মধ্যে যাদের গায়ে নড়বার শক্তিও নেই, তাদেরও সঙ্গে নেওয়া হোক।

এতে সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল—তিনি একদম সিন্ধুর কিনার পর্যন্ত পিছপা হয়ে যাবেন, সেখান থেকে নৌকায় নদী পেরিয়ে এমন কোনো পর্বতশ্রেণির ভেতর গিয়ে লুকোবেন, যা হবে তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে অনেক দূরবর্তী। তাকে খুঁজতে এসে রাজা যখন হতাশ হয়ে ফিরে যাবে, পুনরায় তিনি এ-পারে চলে আসবেন।

যদিও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশন আঞ্জাম দিতে গিয়ে কোনোভাবে তাতারদের কবলে পড়ে যাবারও আশঙ্কা রয়েছে; কিন্তু এই মুহূর্তের আশঙ্কা থেকে বাঁচতে এ ছাড়া কোনো উপায় চোখে পড়ছে না। তাতারদের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, নদীর ওপারে সুলতানের অনুসন্ধানে এখন আর তারা নেই। তাদের ধারণামতে—নদী পেরিয়ে সুলতানের এইপারে ফিরে আসতে-পারা ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার।

সুলতান এই দুঃসাহসিক ও বিস্ময়কর পরিকল্পনা এঁটে উঠলেন তো ঠিকই, কিন্তু এ অনুসারে কাজ আঞ্জাম দেবার সুযোগ মিলল না তাঁর। এর মধ্যেই রাজার বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়ে গেল। সুলতান সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে পিছু হটে কাহের এক ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলেন। জঙ্গলের এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন পদাতিকদের। অশ্বারোহীদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ওদিকে এক পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে রাজার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

রাজার বাহিনী আসছিল সুলতানের পেছন-পেছন। পাহাড়ের পাদদেশে সংকল্পবদ্ধ সহযোদ্ধাদের নিয়ে কামানের উপর তির চড়িয়ে হিন্দু সৈন্যদের অপেক্ষায় রইলেন সুলতান। সুলতানকে দূর থেকেই দেখে ফেলল আগুয়ান হিন্দু রাজা। তাকে দেখামাত্র রাজার চেহারায় ফুটে উঠল উত্তেজনা। তুফানের বেগে হুড়মুড় করে আরোহী ও পদাতিকদের নিয়ে সুলতানের দিকে অগ্রসর হতে লাগল সে।

সুলতান জালালুদ্দীন পাহাড়ের ভারী পাথরের মতো আপন জায়গায় স্থির, নিষ্কম্প। রাজাকে আরও কাছাকাছি আসতে দিচ্ছিলেন তিনি। মাঝখানের দূরত্ব যখন একেবারে কমে এল, রাজার দিকে কামান তাক করে সাঁই করে একটি তির নিক্ষেপ করলেন সুলতান। সেই ছুটন্ত তির সোজাসুজি রাজার সিনায় গিয়ে বিদ্ধ হল। তিরের আঘাতে ঘোড়ার পিঠ থেকে ধপ করে রাজা লুটিয়ে পড়তেই হিন্দু বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল এদিক-ওদিক।[৫]

---

[৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬২; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/২৪০; তারিখে কাবির যাহাবি, ৬২/৬১৮

من عهد عاد كان لنا معروفا، اسر الملوك وقتلها وقتالها

রাজা-বাদশাহদের বন্দি করা, হত্যা করা, তাদের সঙ্গে মোকাবেলায় মেতে ওঠা আমাদের সুপ্রসিদ্ধ অভ্যাস।

এই বিজয়ে সুলতানের সিপাহিরা গনিমত হিসাবে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও রসদপত্র অর্জন করে।

## দ্বিতীয় যুদ্ধ

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। সুলতানের বার্তাবাহক সংবাদ নিয়ে এল—একটু দূরেই শিবির গেড়ে আছে ৪ হাজার হিন্দু সেপাই। সংবাদটা শুনে ভাবিত হয়ে পড়লেন সুলতান। পরক্ষণে পরিকল্পনা সাজালেন—এদের উপর তিনি অতর্কিত আক্রমণ চালাবেন। তারপর ১২০ জন জানবাজকে সঙ্গে নিয়ে আকাশের বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন বেখবর দুশমনদের উপর। অনেক হিন্দু সৈন্য মারা গেল। বাকিরা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেল এদিক-ওদিক। এই সফল অভিযানে মুজাহিদদের চাহিদা পরিমাণ গনিমত অর্জিত হল। এতে পূরণ হয়ে গেল তাদের যুদ্ধাস্ত্রের স্বল্পতা।[৯]

## হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ

এই নিরুপায় অবস্থায় সৈন্যদের নিয়ে অন্যের দেশে লড়ে-যাওয়া এসব যুদ্ধের ধারাবাহিক সফলতায় যেখানেই সুলতানের সৈন্যদের শক্তি হাসিল হয়েছে, সেখানেই স্থানীয় রাজাদের জন্য বেজে উঠেছে শঙ্কার দামামা। কুহে বালালা ও কুহে রাকালার হিন্দু রাজারা সুলতানের এই যুদ্ধ-সফলতায় ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতে লাগল যে, কীভাবে এই বিপদের মোকাবেলা করা যায়?

শেষে তারা ৬ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সুলতানের মোকাবেলায় পাঠিয়ে দিল। উদ্দেশ্য ছিল—সুলতানকে হত্যা করা, নয়তো গ্রেফতার।

সিন্ধুপারের যুদ্ধের পর সুলতানের বিক্ষিপ্ত হয়ে-যাওয়া সেই সিপাহিদের আগমনের ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে একে-একে অনেকে এসে শামিল হচ্ছিল। কিন্তু সুলতানের এই সৈন্যদের সংখ্যা তখনও ৫০০ অতিক্রম করেনি। ঐক্যবদ্ধ হিন্দু বাহিনী যখন সামনে চলে এল, সুলতান এই ৫০০ সৈন্যকেই সারিবদ্ধ করলেন এবং এমন প্রচণ্ডতার সাথে আক্রমণ করলেন যে, সেদিন বারোগুণ অধিক হিন্দুও 'পা মাথায় তুলে' ছুটে পালিয়েছিল দিগ্বিদিক।

---

[৯] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪৩;

কাছাকাছি সময়ের এইসব যুদ্ধ-জয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গেল সুলতানের গ্রহণযোগ্যতা ও শক্তিমত্তা। তখনও সুলতানের পথহারা সিপাহি ও স্বেচ্ছাসেবক দল দূরদূরান্ত থেকে এসে বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। এভাবে তার পতাকাতলে ধীরে-ধীরে জমায়েত হয়ে গেল ৪-৩ হাজার লোক।[৭]

## সুলতানের পশ্চাদ্ধাবন

চেঙ্গিজ খান তখনও সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরেই ছাউনি খাটিয়ে ছিলেন। হিন্দুস্থানে সুলতানের এই যুদ্ধ-সফলতার খবর পেয়ে তিনি অধিক কালক্ষেপণ ক্ষতিকর ভেবে বালা নৈয়ানের নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ একটি ভারী সৈন্যদল প্রদান করে সুলতানকে ধাওয়া করতে পাঠিয়ে দিলেন। তাতারদের আসার সংবাদ পেয়ে দিল্লির দিকে যাত্রা করেন সুলতান জালালুদ্দীন। তার এই ক্ষুদ্র সেনাদল যোগ্য ছিল না একই সময়ে তাতার ও হিন্দু সেনাদের সাথে লড়বার।[৮]

## কুদরতি বাধা

বালা নৈয়ান সুলতানের খোঁজে রওনা দিয়ে দিয়েছে। পথে-পথে বিভিন্ন শহর বরবাদ করতে-করতে সামনে অগ্রসর হচ্ছে সে। বালা নৈয়ানের ত্রাসজনক নিপীড়নের শিকার হল লাহোর, মুলতান ও শাহপুর (বর্তমান সারগোধা)। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন ওর থেকে আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে গ্রীষ্মকালের আগমনের সাথে-সাথে হিন্দুস্থানের প্রচণ্ড গরম গোবি মরুভূমির আলো-বাতাসে বসবাস করে অভ্যস্ত তাতার-সেনাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল। হিন্দুস্থানের গরমে তাতার-বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ধীরে-ধীরে অসুস্থ হয়ে যেতে লাগল। বালা নৈয়ান ব্যর্থ মনোরথে ফের উলটোপথে ফিরে এল। চেঙ্গিজ খানের কাছে এসে বলল—এখানকার জলবায়ুর প্রভাবে আমাদের সেপাইরা মরে যাচ্ছে। খাওয়ার পানিও তাজা ও পরিষ্কার নয়।[৯]

শাহজাদা চোগতাই খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুলতানে হামলা করেছিল। সেখানে তখন রাজত্ব ছিল নাসিরুদ্দীন কিবাছার। তাতাররা অবরোধ করে ফেলেছিল সারা শহর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় করে উঠতে পারেনি। ৪০ দিন পর সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিল। এতে নিশ্চয় শহরবাসীর উন্নত হিম্মতের পাশাপাশি, মধ্য-পাঞ্জাবের প্রচণ্ড গরমকালেরও একটা বিরাট ভূমিকা ছিল।[১০]

---

[৭] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪৪; খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৭;
[৮] চেঙ্গিসখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪;
[৯] চেঙ্গিসখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪;
[১০] তারিখে ফারিশতা (২/৮৯৬) গ্রন্থে এই কারণটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুলতানের পর চোগতাই খানের এই বাহিনী যাত্রা করেছিল বেলুচিস্তানের দিকে। মাকরান ও খাজদারে অসংখ্য মানুষের রক্ত ঝরিয়ে সিন্ধুর তীরে এসে ছাউনি স্থাপন করেছিল। আর সেখানে চোগতাই খান হিন্দুস্থানের বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েদকৃত হাজারও লোককে স্রেফ এ-কারণে হত্যা করে ফেলেছিল যে—এদের উপস্থিতির কারণে তাতার-বাহিনীর ভেতর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এটা ছিল হিন্দুস্থানের গরম মৌসুমের প্রাদুর্ভাব।[১১]

যা হোক, সিন্ধুপারের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে তাতারদের সৈন্যশক্তিতে সুলতান একটা বড় ঝটকা লাগাতে পেরেছিলেন। এবার মৌসুমের প্রতিকূলতায় ক্ষয়ক্ষতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। চেঙ্গিজ খান তাই পরিত্যাগ করেন অগ্রযাত্রার তাবৎ ইচ্ছা। এতে করে হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ ব্যতীত সমস্ত এলাকা তাতারদের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হয়ে যায়।[১২]

কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে—হিন্দুস্থানে চেঙ্গিজ খানের আর অগ্রসর না-হবার পেছনে তার কিছু সংশয় ও অশুভ ধারণারও বড় দখল ছিল।[১৩]

## প্রত্যাবর্তন

চেঙ্গিজ খান এবার নিজ দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। তার জন্য চীন ও মোঙ্গলিয়ায় ফিরে যাওয়া এ-কারণে জরুরি হয়ে উঠেছিল যে, ক'দিন আগেই ওখানে মারা গিয়েছিল তার নায়েব মাকুলি বাহাদুর। বিজিত, হিয়া সাম্রাজ্যে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। ফেরার জন্য প্রথমে তিনি কাশ্মিরের রোখ নিলেন। কিন্তু সামনে অনতিক্রমণীয় পর্বতশ্রেণি দেখে পুনরায় সেই পথেই ফিরে গেলেন, পূর্বে যেদিক থেকে এসেছিলেন।[১৪]

ফেরার পথে পেশোয়ার বরবাদ করে যাত্রা আরম্ভ করলেন সমরকন্দের দিকে। পথিমধ্যে গজনির লোকদের হত্যা করে বিধ্বস্ত করে দিলেন শহর। সুলতান মাহমুদ গজনবির কবরের ভেতর থেকে তার হাড্ডি বার করে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। অদ্রুপ যাবেল, গজনি, ঘুরসহ খোরাসানের ছোটখাট জনগোষ্ঠীকেও নিশ্চিহ্ন করে দিলেন তিনি, যাতে এই এলাকাগুলো থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের সাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা বাকি না-থাকে।[১৫]

---

[১১] রওজাতুস সফা, ৫/৪০;

[১২] চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪; রওজাতুস সফা, ৫/৪০;

[১৩] জামিয়ে তারিখে হিন্দ, বর্ণনা করেছেন খালেক আহমাদও হাবিব আহমাদ, মুদ্রণ লাহোর।

[১৪] চেঙ্গিসখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৪;

[১৫] রওজাতুস সফা, ৫/৪০; আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ, ২২৫;

## শিক্ষার উপাদান

এখনো পর্যন্ত মুসলিম কয়েদিদের একটা বড় সংখ্যা বাধ্যতামূলকভাবে তাতারদেরকে সেবা-শুশ্রূষা প্রদানের জন্য তাদের সাথে-সাথে ঘুরে ফিরছিল। চেঙ্গিজ খান দেখলেন, এখন এদের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি গণহত্যার নির্দেশ দিলেন।[১১] কিছু সময় সমরকন্দে কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন। বিজয়ের আনন্দ দ্বিগুণ করে তুলতে খাওয়ারিজম শাহের মা তুর্কান খাতুন ও শাহি খানদানের অন্যান্য বেগম-শাহজাদিকে হুকুম করলেন—চলো, তোমরা বাহিনীর আগে আগে চলতে থাকো। উচ্চ আওয়াজে হা-হুতাশ করতে-করতে খাওয়ারিজম শাহ ও তার হারানো রাজ্যের কথা ভেবে-ভেবে বুক চাপড়ে মর্সিয়া গাইতে থাকো![১২]

সাইহুন-নদীর তীরে, চেঙ্গিজ খান যেখান থেকে খাওয়ারিজম রাজ্যে ঢুকেছিলেন, সেখানে ছিল শস্য-শ্যামল বিশাল প্রান্তর। চেঙ্গিজ খান বিজয়োৎসব করার জন্য বাহিনীর সব সরদারকে এই প্রান্তরে তলব করলেন।

হ্যারল্ড ল্যাম্ব এই উৎসবের একটা নকশা টেনেছেন। সেখান থেকে শিক্ষামূলক একটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি—এ-সময় চেঙ্গিজ খান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের ময়ুর-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। এই সিংহাসন তিনি সঙ্গে করে সমরকন্দ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তার কাছে মৃত খাওয়ারিজম শাহের মুকুট ও শাহি লাঠিও সংরক্ষিত ছিল। মাঠের ভেতর আরম্ভ হল জমকালো উৎসব। খাওয়ারিজম শাহের মাকে (তুর্কান খাতুন) হাতকড়া পরিয়ে টেনে-হিঁচড়ে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা হল।[১৩]

উৎসব শেষে চেঙ্গিজ খান গোবি মরুভূমির দিকে রওনা দিলেন। তার মন খুবই প্রশান্ত যে, তার বিরোধীপক্ষের শক্তি এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সিন্ধুতীর থেকে কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত উড়ে চলেছে কেবল তাতারদের বিজয়পতাকা। মুসলিমদের এই বিরাট সাম্রাজ্যের কয়েক শতাংশ লোক, যারা আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তারাও হয়ে গেছে তাতার-বিজেতাদের দাসানুদাস।

## দিল্লির বাদশাহর দোরগোড়ায়

সুলতান জালালুদ্দীন দিল্লি থেকে দুই-তিন মনজিল দূরত্বে ডেরা স্থাপন করে সাইয়েদ আইনুল মুলক নামের এক বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাকে পত্রবাহক হিসেবে সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের দরবারে পাঠালেন, যাতে ইলতুৎমিশকে তাতার-ফেতনার সর্বগ্রাসী আগ্রাসন ও গণহত্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তোলা যায়

---

[১১] চেঙ্গিজ খান; রওজাতুস সফা, ৫/৪০

[১২] রওজাতুস সফা, ৫/৪১;

[১৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ২১, পৃষ্ঠা : ১৫৯

এবং ক্রমাগত সয়লাবের মতো নেমে আসছে যেসব বিপদ, সে ব্যাপারে তার সামনে একটা চিত্র উপস্থাপন করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য তার থেকে সাহায্যের আবেদন করা যায়।

ইলতুৎমিশের নিকট প্রেরিত চিঠিতে সুলতান লিখেছিলেন, 'নিশ্চয় শরিফ আদমি সম্মানিত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ান। কালের দুর্যোগ আমাকে আপনার প্রতিবেশিত্বে আসবার ও সাক্ষাৎ করবার একটা অধিকার দিয়ে দিয়েছে। এমনতরো মেহমান খুব কমই আসে। আমরা যদি পবিত্র মহব্বত ও পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ করি, সুখ-দুঃখের কালে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উঠি, তা হলে আমাদের দু'পক্ষের সমস্ত উদ্দেশ্য খুব সহজেই আমরা স্বার্থক করতে পারব। মুসলিমদের দুশমন যখন আমাদের ঐক্যবদ্ধতার সংবাদ শুনতে পাবে, ভোঁতা হয়ে যাবে তাদের আক্রমণাত্মক দন্ত।[১৯]

## ইলতুৎমিশের ফিরতি জবাব

সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন অতি সতর্কপ্রকৃতির শাসক। তিনি ভাবলেন, সুলতান জালালুদ্দীনকে প্রকাশ্যে সাহায্য করতে গেলে আমার জন্য তৈরি হয়ে যেতে পারে অনেক ঘোরপ্যাঁচ ও শঙ্কামূলক বিষয়।

তিনি নিজেই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্ত চক্রান্ত দাবিয়ে রেখে খুবই কষ্টে রাজসিংহাসন সামলাচ্ছিলেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কিবাছা ও তার মতো কিছু বিদ্রোহী নেতা ইলতুৎমিশের কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থান করছিল তখনও। প্রতিবেশী স্বাধীন হিন্দু রাজারা প্রথমেই সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে যুদ্ধ করে বসেছিল। এমনকি, সুলতান জালালুদ্দীনের বীরত্ব, যুদ্ধকৌশল ও দিগন্তজোড়া প্রসিদ্ধি দেখে স্বয়ং ইলতুৎমিশেরও ভয় হচ্ছিল—আচ্ছা, সুলতান যদি ক'দিন পরে হিন্দুস্থানে পা মজবুত করে স্বয়ং দিল্লির সিংহাসনের জন্যই নতুন এক শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে!

এইসব বিষয় বাদ দিলেও, সুলতান ইলতুৎমিশের সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা হচ্ছিল আরেকটা ব্যাপার নিয়ে। তা হল—সুলতানকে যদি আমি মদদ করতে যাই, তাতাররা তা হলে আমাদের হিন্দুস্থানে হামলে পড়বার শক্ত একটা বাহানা পেয়ে যাবে।

এ ছিল এমন এক শঙ্কা, যার স্রেফ কল্পনাই ইলতুৎমিশের মতো নিজের আখের গোছানো নিয়ে ব্যস্ত শাসকের গায়ে কম্পন ধরিয়ে দেবার জন্য ছিল যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও, যেহেতু সুলতান এখন তার একজন প্রতিবেশী ও মুসলিম

---

[১৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪৪;

শাসক, এবং তার কাছে তিনি ইসলাম ও মিল্লাতের নামে সাহায্য তলব করতে এসেছেন, এজন্য সুলতান ইলতুৎমিশ ভাবলেন—জালালুদ্দীনকে সাফ-সাফ অস্বীকৃতি জানিয়ে দেওয়াটাও কেমন যেন অভদ্রতা।

শেষমেশ কয়েকদিনের চিন্তাভাবনার পর তিনি সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য মূল্যবান উপঢৌকন এবং তার বাহিনীর জন্য রসদপত্রের বিপুল ভান্ডারসহ প্রত্যুত্তরমূলক একটি চিঠি পাঠালেন। লিখলেন—হিন্দুস্থানের আবহাওয়া আপনার জন্য প্রতিকূল। এখানে অবস্থান করতে গেলে আপনার বাহিনীর স্বাস্থ্যে অনেক মন্দ প্রভাব পড়বে। উত্তম হবে অন্যকোনো এলাকাকে আপনার অভিযানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু আপনি যদি এখানেই থাকতে পছন্দ করেন, তা হলে আমি আপনার অবস্থানের জন্য দিল্লির উপান্তে একখণ্ড ভূমি বরাদ্দ করতে সম্মত আছি। এমনকি এই মুলুকের যে-সমস্ত এলাকা অবিজিত রয়ে গেছে, সেখান থেকে যে অঞ্চলই আপনি নিজ শক্তিবলে বিদ্রোহী ফেতনাবাজদের থেকে পবিত্র করতে পারবেন, সেখানেও আমরা আপনার শাসন মেনে নেব।'

সুলতান জালালুদ্দীন ইলতুৎমিশের এই জবাবি পত্র পেয়ে বুঝে গেলেন—দিল্লির বাদশাহ আমাদের এই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

ফলে সুলতান এদিক থেকে নিরাশ হয়ে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধ এলাকাগুলোর দিকে নিবিষ্ট হলেন। সংকল্প করলেন—বাহুর জোরে সেখানকার কিছু এলাকা জয় করে আগত সমস্ত ঝড়ের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একটা উপায় বের করবেন তিনি।[২৩]

## পাঞ্জাব ও সিন্ধুতীরের তাজা বিজয়

সিন্ধুপারের শাসকরা যখন সুলতান জালালুদ্দীনের এই অগ্রাভিযান সম্পর্কে অবগত হল, ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গেল তারা। সিন্ধুনদের উপত্যকার সবচেয়ে বড় রাজা ছিল রাও খোখর সিনকিন। সে সুলতানের চকচকে তরবারি দেখে নতি স্বীকার করে জালালুদ্দীনের আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে। এবং তার এই আজ্ঞাবহতাকে সুদৃঢ় করে তুলতে নিজের পুত্রকে সে সুলতান জালালুদ্দীনের খেদমতে প্রেরণ করে দেয়। সুলতান এতে আনন্দিত হয়ে রাজার ছেলেকে কিতলুগ খান উপাধি ও রাজকীয় পোশাক প্রদান করেন। এদিকে পাঞ্জাবের শাসক কিবাছার নায়েব কমরুদ্দীনও সুলতানের কাছে বিভিন্ন তোহফা পাঠিয়ে তার হিতাকাঙ্ক্ষিতা প্রকাশ করে।[২৪]

কুহেজুদের শাসক তখন সুলতানের শক্তি নিঃশেষ করে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি বাহিনীও গঠন করে ফেলেছিল

---

[২৩] জাহাঁকুশা, ২/১৪৫; খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৮;

[২৪] জাহাঁকুশা, ২/১৪৫; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬২;

সে। সুলতান জালালুদ্দীনের অবস্থান তখনও যথেষ্ট দুর্বল; এজন্য এই শাসকের সাথে মোকাবেলার জন্য মাঠে নামছিলেন না তিনি। কেবল এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দিল্লি থেকে ফিরে আসার পথে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা পৌঁছে গেল ১০ হাজারের কোঠায়। ফলে তিনি তখন প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করা জরুরি মনে করলেন। সেনাপতি তাজুদ্দীন মালিকের হাতে বাহিনীর একাংশ প্রদান করে তাকে কুহেজুদের শাসকের মোকাবেলায় রওনা করিয়ে দিলেন। তাজুদ্দীন মালিক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বিপুল পরিমাণ গনিমত লাভ করেন।[৯২]

## গিয়াসুদ্দীনের গড়ে-ওঠা নতুন রাজত্ব

সুলতান জালালুদ্দীনের সৈন্যদল হঠাৎ করেই প্রবৃদ্ধি ঘটার বড় একটা কারণ হল, ইরাক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে খাওয়ারিজমি সিপাহিদের তাজা সেনাসাহায্য এসেছিল। হয়েছিল এই—সুলতান জালালুদ্দীনের ভাই গিয়াসুদ্দীন তাতারদের অস্থায়ী প্রত্যাবর্তনের পর ইরাক ও ইরানের কিছু অংশ ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। তাতারদের আক্রমণের সময় ইরানের ইস্পাহান শহরের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল সে। সৌভাগ্যের বিষয় হল—তাতাররা তখন এই শহর দখল করতে পারেনি। দীর্ঘ অবরোধের পর তারা ফিরে গিয়েছিল। তাদের চলে যাবার পর খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের হাজারও বিক্ষিপ্ত সৈনিক এসে গিয়াসুদ্দীনের কাছে সমবেত হয়েছিল। এবং তার জন্য তারা অনুগত করে ফেলেছিল কিরমান থেকে খোরাসান পর্যন্ত বিপুল-বিস্তৃত এলাকা। কিন্তু শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন ছিল অনভিজ্ঞ ও বিলাসপ্রবণ লোক। সাম্রাজ্যের তাবৎ বিষয়ে সে এতটা অমনোযোগী ও বেপরোয়া ছিল যে, রাজ্যের সমস্ত কিছুর দেখভাল তখন একা তার মাকেই করতে হচ্ছিল।

এই অবস্থাপট দেখে অভিজ্ঞ সরদাররা নিজেদের মধ্যে অভিমত ব্যক্ত করল যে, এখন এখানে সুলতান জালালুদ্দীনের ফিরে আসা দরকার। আমরা চাই, তিনি এসে মজবুত হাতে এই নতুন সাম্রাজ্য সামলে নিন। আর শাহজাদা গিয়াসুদ্দীন সুলতানের নায়েব হয়ে থাকুক।

ফলে, এই আমির-সরদাররা সুলতানের কাছে প্রথমত এ বিষয়ে চিঠি পাঠাল। তারপর তাদের কিছু আমির, যেমন : সাঞ্জকান খান, এলচি পাহলোয়ান, আওর খান ও তার্কশাক জিনাকশি নিজেদের সেপাইদের নিয়ে সুলতানের কাফেলায় এসে মিলিত হয়। সুলতানের সামনে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে থাকে। এই টাটকা সেনাসাহায্য পেয়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় সুলতানের শক্তি।

---

[৯২] জাহঁকুশা, ২/১৪৫; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

নাসাবির বর্ণনা—এই সৈনিকদের আগমনে সুলতানের এতটা শক্তি মিলল যে, তৎক্ষণাৎ তিনি কিবাছার সাথে সেই যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, যার সমস্ত কার্যকারণ পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১৩]

## কিবাছার অপকর্ম

পাঠক, ইতিপূর্বে পড়ে থাকবেন—সিন্ধুতীরের যুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীনের সিপাহসালার আমান মালিক তাতারদের হাতে পরাজিত হয়ে পেশোয়ারের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পালাবার কালে আমান মালিকের মেয়েকে—যাকে তিনি সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন—সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পেশোয়ারের কাছাকাছি স্থানে পথিমধ্যে তাতাররা আমান মালিকের কাফেলা ঘেরাও করে ফেলে।[১৪] তাদের হাতে শহিদ হয়ে যান আমান মালিক ও তার অধিকাংশ সাথি। তার অল্পবয়সি পুত্র কারিন খান ও কন্যা (সুলতানের স্ত্রী) কোনোভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে এক দিকে ভেগে যান।

কিন্তু সবদিকে তখন হা করে দাঁড়িয়ে ছিল মৃত্যু। মাথার উপর ভরসার একটা হাত রাখবার কেউ ছিল না। সুলতানেরও খোঁজ ছিল না তিনি কোথায় আছেন। শেষে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নানা রকমের দুঃখকষ্ট সয়ে এই দুই নিরুপায় ভাইবোন সিন্ধুতে পৌঁছে গেল। সেখানে তখন রাজত্ব ছিল নাসিরুদ্দীন কিবাছার।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে তারা একদল লোলুপ লোকের খপ্পড়ে পড়ে গেল। কারিন খানের কানের লতিতে মূল্যবান একটি মোতি ছিল। এক বদবখত এসে এই নিষ্পাপ এতিম ছেলেটাকে হত্যা করে সেই মোতি ছিনিয়ে নিল। কিবাছার কাছে গিয়ে এই মোতিটি সে উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করল। নির্দয় কিবাছা এই হন্তারকের অপরাধে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সে এই তোহফা তো গ্রহণ করলই, উলটো হন্তারককে বিপুল অর্থ প্রদান করে সম্মানিত করল। তবে আমান মালিকের মেয়ের জন্য এতটুকু অবশ্য করল যে, সে তাকে তার ওখানে থাকবার জায়গা করে দিল।

এর মধ্যেই কিবাছার দরবারে সুলতান জালালুদ্দীনের পরাজিত বাহিনীর বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও এসে পৌঁছেছিল। তাদের ভেতর একজন ছিল শামসুল মুলক শিহাবুদ্দীন। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জামানায় সুলতান জালালুদ্দীনের উজির ছিল সে। অন্যজন ছিল নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ। সে হেরাতের ঘুরি শাসক হাসান ইবনে খিরমিলের পুত্র।

---

[১৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৬৪

[১৪] জাহাঁকুশা, ২/১৪৭;

নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ যখন জানতে পারে—কিবাছার এখানে আমান মালিকের পুত্রের হত্যাকারীকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, ক্রোধে সে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু অবস্থার বাধ্যবাধকতার দরুন কিছু করে উঠতে পারে না। চুপ করে থাকে।

অন্যদিকে কিবাছা ভেবেছিল—সুলতান জালালুদ্দীন এখন চিরতরে রাজত্ব-বঞ্চিত হয়ে পথহারা এক উন্মাদে পরিণত হয়েছেন। এজন্য সুলতানের উজিরের উপস্থিতিতেও তার শানে অত্যন্ত আপত্তিজনক কথাবার্তা বলে যাচ্ছিল সে। শামসুল মুলক ছিল এই ঔদ্ধত্যের চাক্ষুষ সাক্ষী। কিন্তু সংকটময় পরিস্থিতি দেখে সেও নিশ্চুপ রইল।

এই দুটো ঘটনাই কিবাছাকে সুলতানের কাছে তিরস্কারযোগ্য বানিয়ে ফেলেছিল। পরিণামে ঘটেছিলও তা-ই।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন দিল্লি থেকে ফিরে সিন্ধুতীরে এসে আক্রমণ করলেন, তখনই জানলেন—তার এক স্ত্রী (আমান মালিকের মেয়ে), সহযোদ্ধা নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদ ও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে উজির শামসুল মুলক এ মুহূর্তে কিবাছার আশ্রয়ে রয়েছে।

সুলতান কিবাছার উদ্দেশে দ্রুত চিঠি লিখলেন—এক্ষুনি এদের সবাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

চিঠি পাওয়ামাত্র কিবাছা সুলতানের স্ত্রীকে মূল্যবান উপঢৌকনসহ (তাতে একটি যোদ্ধা হাতিও ছিল) সুলতানের খেদমতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু শামসুল মুলকের ব্যাপারে কিবাছার আশঙ্কা ছিল যে, শামসুল মুলক তার কুৎসিত কথাবার্তা সুলতানকে জানিয়ে দেবে। এই ভয়ে সে শামসুল মুলককে মেরে ফেলল। এটা ছিল কিবাছার তৃতীয় অন্যায়।

নুসরাত উদ্দীন মুহাম্মদের ব্যাপারে কিবাছার স্বস্তি ছিল যে, নুসরাত উদ্দীন হয়তো আমার জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে না। কারণ, কিবাছা ও নুসরাত উদ্দীন দুজনের খানদানই ছিল ঘুরি সুলতানদের অনুগত। এই পুরোনো সম্পর্কের কথা ভেবেই নুসরাতের ব্যাপারে কিবাছার মনে কোনো শঙ্কা জাগেনি। তাকে সুলতানের কাছে এ মর্মে একটি লিখিত চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল যে, শামসুল মুলক স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।[৯৮]

কিন্তু, নুসরাতের ব্যাপারে কিবাছা যে ধারণা পোষণ করেছিল, তা ছিল ভুল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নুসরাত উদ্দীনের খানদান ঘুরি শাসকদের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়েছিল।[৯৯] এবং তারা প্রতিপক্ষ ছিল খাওয়ারিজম শাহি খানদানের।

---

[৯৮] নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৭; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৯; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;
[৯৯] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ৮৩;

স্বয়ং নুসরাত উদ্দীনের পিতা হাসান ইবনে খিরমিলও খাওয়ারিজম শাহি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল। এতকিছুর পরেও নুসরাত উদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ও ওয়াফাদার হিসেবেই রইল। সুলতানকে মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষক মনে করে তার একটিমাত্র ইশারায় জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকত সে।

## কিবাছার সাথে লড়াই

নুসরাত উদ্দীন সুলতান জালালুদ্দীনের দরবারে পৌঁছে খুলে বলল কিবাছার সব ঘটনা। আমান মালিকের পুত্রের হত্যাকারীকে কিবাছা যে বাহবা দিয়েছে, সে-কথা এবং শামসুল মুলকের হত্যার কথা শুনে রক্ত লাল হয়ে উঠল সুলতানের চোখ। ততক্ষণে সুলতানের ভ্রাতা গিয়াসুদ্দীনের কিছু প্রতিপক্ষ-আমির নিজ-নিজ সৈন্যদের নিয়ে ইরান থেকে হিন্দুস্থানে চলে এসেছিল। এতে সুলতানের বেড়ে গিয়েছিল যথেষ্ট সেনাশক্তি। ফলে, কিবাছার সাথে এখন টক্কর দেওয়া মুশকিল কিছু ছিল না।

সুলতান প্রথমত কিবাছার মজবুত দুর্গ কলুরে (বর্তমান কলুরকোট) আক্রমণ করলেন। এই শহরেই ছোট্ট কারিন খানকে হত্যা করা হয়েছিল। শক্ত অবরোধ ও দিনরাত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পর পদানত হল কলুর। এ যুদ্ধ চলাকালে এক ধাওয়ার ভেতর একটি বিষাক্ত তির লেগে সুলতানের বাহু জখমি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বারনুযাজ দুর্গে আক্রমণ করে সেখানটাও কবজা করে নিলেন তিনি। এখানেও সুলতানের গায়ে এসে বিদ্ধ হল একটি উড়ন্ত তির। এর কারণ— বারনুযাজ এলাকাতেও সাধারণ এক সিপাহির মতোই যুদ্ধে শামিল ছিলেন সুলতান।[৩৭]

এইসব বিজয়ের পর আহত সুলতান খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন তো দূরের কথা, দ্রুতই সেনাপতি জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুকের হাতে ৭ হাজার সিপাহি প্রদান করে কিবাছাকে শায়েস্তা করতে পাঠালেন। এই বাহিনীতে রাজা খোখর সিনকিনের পুত্রও অংশগ্রহণ করেছিল। কিবাছা ২০ হাজার সেপাই-সমৃদ্ধ একটি বাহিনী-সমেত সিন্ধুতট থেকে এক ফারসাখ দূরের 'উচ' নামক স্থানে এসে ছাউনি স্থাপন করল।[৩৮] জাহাঁ পাহলোয়ান তার সৈনিকদের নিয়ে রাত্রিবেলা এসে কিবাছার বাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।[৩৯] কিবাছার সৈন্যরা এই আচানক আক্রমণে হুড়োহুড়ি ও ছুটোছুটি শুরু করে দিল সন্ত্রস্ততায়। কিবাছার সেনা-শিবির থেকে প্রচুর গনিমত লাভ

[৩৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৬৪, ১৬৫; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৭৬;
[৩৮] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬; ইবনে খালদুন, ৫; তারিখে ফারিশতা, ২/৮৯৫;
[৩৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

করল জাহাঁ পাহলোয়ান। তারপর সুলতানের কাছে সে পাঠিয়ে দিল যুদ্ধ-সফলতার সংবাদ।[৩০] সুলতান তখন নিজে অগ্রযাত্রা আরম্ভ করলেন। উচ এলাকায় পৌঁছে কিবাছার সাবেক সেনাশিবিরে ডেরা গড়ে নিলেন তিনি। কিবাছা জাহাঁ পাহলোয়ানের মোকাবেলা থেকে পালিয়ে নদীর দ্বীপে অবস্থিত বাখার[৩১] দুর্গে গিয়ে উঠল। সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকল সে। একদিন মওকা পেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে মুলতান পৌঁছে যেতে সক্ষম হল।[৩২]

গরমকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড গরমে পাঞ্জাবের ময়দানি এলাকা যেন ক্রোধে স্ফুলিঙ্গ ছিটাচ্ছিল। সুলতান জালালুদ্দীন বালালা, রাঁকালা ও জুদ পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য হল—সেখানে তিনি গরমকালটা কাটাবেন। রাস্তায় বসরাওয়ার (পাসরুর) নামক এক দুর্গ অবরোধকালে আবার তিনি আহত হলেন। কারণ, এই হামলায় সাধারণ সৈনিকদের সাথে শরিক ছিলেন তিনিও। তার বাহুতে একটি তির এসে বিঁধেছিল।[৩৩]

শেষে দুর্গটি বিজিত হল। সুলতান গরমকালের কিছু সময় নিজের পাহাড়ি ছাউনিতে এসে কাটালেন।[৩৪] ক'দিন পরে সংবাদ এল—তাতার-সেনাদের একটি দল তার অন্বেষায় এই উঁচু এলাকার কাছাকাছি-দূরত্বে উৎপাত আরম্ভ করেছে।

ঐতিহাসিক ফারিশতার বর্ণনায় রয়েছে, তাতারদের এই দলটির নেতৃত্ব ছিল চোগতাই খানের হাতে। যুক্তি বলে, এই তাতার-বাহিনী সুলতানের কবজাকৃত এলাকাগুলোর আশপাশেই ভ্রমণ করছিল।

---

[৩০] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

[৩১] এখন এখানে পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ শহর ভাকার অবস্থিত। শহরটি মুলতানের কাছাকাছি

[৩২] জাহাঁকুশা, ২/১৪৬, ১৪৭;

[৩৩] জাহাঁকুশা, ২/১৪৭; রওজাতুস সফা, ২/৮২৮; পাসরুর সিয়ালকোটের উপান্তবর্তী একটি শহর। স্মর্তব্য যে, আন-নাসাবির বর্ণনা অনুযায়ী কলুর ও বারনুযাজ অবরোধেও সুলতানের হাতে তিরের আঘাত লেগেছিল।

[৩৪] কলুরকাহার পাহাড়ি উপত্যকার চিনজি নামক গ্রাম থেকে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে নিরাম নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। সেখান থেকে ১ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে গেলে একটি পাহাড় চোখে পড়ে। এই পাহাড়ের উপর ৬০০ মিটার লম্বা ও ৩০০ মিটার চওড়া একটি প্রাচীন দুর্গ রয়েছে, যা সমরকন্দ দুর্গ নামে প্রসিদ্ধ। অভিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এই দুর্গ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই হিন্দুস্তানে এসেছিলেন। তার সেনাছাউনি এই পাহাড়ি এলাকার এমনই এক নিরাপদ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। উরদু ডাইজেস্ট ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত এক আলোচনায় পাকিস্তানি ভূগোলবিদ জনাব সালমান রাশেদ উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমরকন্দ দুর্গই ছিল মূলত সুলতান জালালুদ্দীনের গ্রীষ্মকালীন সেনাছাউনি। এই দুর্গ নির্মাণ বা মেরামতের পর সুলতান জালালুদ্দীন তার দেশের সমরকন্দ শহরের স্মরণে এই দুর্গটির নাম দিয়েছিলেন সমরকন্দ-দুর্গ।

যা হোক, সুলতান এদের সাথে মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হওয়া মুনাসিব মনে করলেন না। ফের দ্বিতীয়বার পাঞ্জাবের দিকে চলে গেলেন।

ঐতিহাসিক ফারিশতা বলেন—তখন সুলতানের সন্দেহ হচ্ছিল, পাঞ্জাবের হাকিম কিবাছা হয়তো তার বিরুদ্ধে চোগতাই খানকে মদদ যোগাচ্ছে। এজন্য তাতারদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না-হয়ে তিনি স্বয়ং কিবাছাকে ধ্বংস করতে পাঞ্জাবের দিকে এগিয়ে গেছিলেন।[৩৫]

## লাহোর, উচ ও সিদিস্তান বিজয়

মুলতানের পাশ দিয়ে যাবার সময় কিবাছার কাছে সুলতান জালালুদ্দীন নালবাহা (একপ্রকার ট্যাক্স, যা করদাতাদের থেকে গ্রহণ করা হতো) তলব করলেন। কিবাছা তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাল। দম্ভভরে সুলতানের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল সে।

সুলতান ভাবলেন—এখন কিবাছার সাথে যুদ্ধে নামার ব্যাপারটা কল্যাণকর মনে হচ্ছে না। এজন্য তিনি কিছুক্ষণ অবস্থানের পর লাহোরের দিকে যাত্রা করলেন। কিবাছার এক পুত্র ছিল লাহোরের স্বাধীন শাসক। সে সুলতানের সামনে আনুগত্য প্রকাশ করে নিজেকে হেফাজত করে নিল।[৩৬]

ওদিকে উচের বাসিন্দারা ধীরে-ধীরে মাথা ওঠাচ্ছিল সুলতানের বিরুদ্ধে। সুলতান তার অসামান্য দক্ষতায় উচ এলাকাকেও অধীনস্থ করে ফেললেন। সেখান থেকে তিনি সিন্ধুপ্রদেশের সিদিস্তান (সিহওয়ান) অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলেন। কিবাছার পক্ষ থেকে নিযুক্ত এখানকার হাকিম ফখরুদ্দীন সুলতানের বাহিনীর মোকাবেলার জন্য ছিল পুরোপুরি তৈরি। সুলতান জালালুদ্দীনের অগ্রবর্তী দলটি (যারা ছিল সেনাপতি আওর খানের নেতৃত্বে) যখন এখানে এসে পৌঁছল, তখন সিদিস্তানের সিপাহসালার লাজিন খাতাই তাদের সাথে শক্ত সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রাণ হারাল সে। আওর খান আগে বেড়ে অবরোধ করে ফেলল সারা শহর।

সুলতান জালালুদ্দীন অবশিষ্ট সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে যখন এখানটায় এসে পৌঁছেন, সিদিস্তানের হাকিম ফখরুদ্দীন তখন হাতে তির ও কাফনের একটা কাপড় নিয়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে সুলতানের খেদমতে এসে উপস্থিত হয়। সে সুলতানের সামনে ওজরখাহি করে তার আনুগত্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ওঠে। সুলতান এবারকার মতো তাকে ছাড় দিয়ে দেন এবং সিদিস্তানের সিংহাসনে তাকেই বহাল রাখেন।[৩৭]

---

[৩৫] তারিখে ফারিশতা, ২/৮৯৫,

[৩৬] তারিখে ফারিশতা, ২/৮৯৫, ৮৯৬; জাহাঁকুশা, ২/১৪৭; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

[৩৭] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪৭; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৫০;

## দেবল অঞ্চলে

সিদিস্তানে একমাস অবস্থানের পর দেবলের দিকে যাত্রা করেন সুলতান জালালুদ্দীন।[৩৮] বাহিনীর একাংশ তিনি উৎকৃষ্ট সেনাপতিদের নেতৃত্বে প্রদান করে নহরওয়ালার দিকে পাঠিয়ে দেন।

দেবল ছিল আরব-উপসাগরের পারে অবস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ ফৌজি ও বাণিজ্যিক শহর। প্রথমে উমাইয়া খেলাফতের সময় একে জয় করেছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। আব্বাসি খেলাফতকালেও এই শহর ইসলামি খেলাফতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন ইঙ্গিত ও আলামত দেখে মনে হয় হিজরি সপ্তম শতকে (খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) যখন সুলতান জালালুদ্দীন এই শহরে আক্রমণ করেছিলেন, তখন এখানে রাজত্ব ছিল হিন্দু রাজাদের।

জাহাঁকুশা জুয়াইনির বর্ণনা থেকে জানা যায়—সে-সময় এ শহরে কোনো মসজিদ পর্যন্ত ছিল না। সুলতান জালালুদ্দীন তরবারির জোরে দেবল কবজা করে শহরের মন্দিরের স্থলে প্রথমবারের মতো একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন।[৩৯] শহর যেহেতু যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, এ-কারণে হিন্দুদের সাথে এরকম কোনো সন্ধিচুক্তির জন্য সুলতান বাধ্য ছিলেন না, যার জের ধরে বলা যাবে যে, মন্দিরের স্থলে তার মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারটা আপত্তিকর কিছু হয়েছে।

## একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

করাচি থেকে ৪০ মাইল দূরের হায়দারাবাদ যাওয়ার পথের পাশে 'বানভুর' নামের এক বিধ্বস্ত শহরের ধ্বংসাবশেষের দেখা মেলে। পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ-এর উদ্যোগে এই প্রাচীন শহরটি নিয়ে 'বানভুর' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও প্রেক্ষাপটের সহায়তায় অনুমান করা হয়েছে যে, বানভুর মূলত দেবলেরই অপর নাম। কীভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এই বানভুর? এ সম্বন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মনে হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বানভুরের পতন ঘটেছে। এর একটি কারণ তো ছিল এই—ওই যুগে নদী তার যাত্রাপথের বাঁক পালটে নিয়েছিল (সিন্ধুনদ তখন এই শহরের খানিক দূর দিয়েই প্রবাহিত হতো)।

আরেকটি কারণ হল, সেকালে এখানে এক প্রবল হাঙ্গামা বেধেছিল। সেই হাঙ্গামার আলামত এখনো পুরো ভগ্নস্তূপেই মেলে। বিভিন্নাংশে যত্রতত্র জমিন গর্ত হয়ে গেছে। সেখান থেকে অসংখ্য কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে।

এক্ষেত্রে আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল—খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝিতে যখন সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুতে আক্রমণ করেছিলেন, তখন তিনি

---

[৩৮] জাহাঁকুশা জুয়াইনি ২/১৪৮

[৩৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪৮

জয় করে নিয়েছিলেন এখানকার তীরবর্তী কয়েকটি গ্রাম। এমনকি দেবলের শেষ বিধ্বস্ততার বিষয়টাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়।'[৪০]

এই উদ্ধৃতাংশের 'সম্বন্ধ করা হয়' শব্দ তিনটেই ব্যক্ত করছে এই বর্ণনা দুর্বল। আর বাস্তবতা এটাই যে, ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত কোনো গ্রন্থেই দেবল বিধ্বস্ততার দায়ভার সুলতান জালালুদ্দীনের উপর আরোপ করা হয়নি। তবে এটুকু নিশ্চয় জানা যায় যে, সুলতান তখন এই এলাকা দখল করেছিলেন।

### নতুন বিজয়ের ধারা

দেবল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান জালালুদ্দীন দামরিলাও দখল করে নিলেন। সেই একই সময়ে সুলতানের এক জেনারেল নহরওয়ালা জয় করে গনিমতের মাল, মালবহন ও আরোহণের উট লাভ করেছিল।[৪১]

## সুলতান ইলতুৎমিশের সাথে মনোমালিন্যের কারণ

তখন সুলতান জালালুদ্দীনের হিন্দুস্থান আগমনের দ্বিতীয় বছর পড়েছে। এর ভেতর ঘটে গেছে নতুন অনেক যুদ্ধাভিযান, যা একটিবারের জন্যও তাকে একটুখানি অবসর হয়ে বসতে দেয়নি। সুলতান দেখেছিলেন যে, বিশ্বব্যাপী এক প্রলয়ঙ্করী আগ্রাসনের ধ্বংসাত্মক কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও এই পড়শি হিন্দুস্থান সাম্রাজ্য তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত নয়। জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে একটা সবক প্রদান করেছিল যে, পৃথিবীতে কেবল শক্তিরই কদর করা হয়। যুদ্ধে যেসব সৈনিক হেরে যায়, তাদের পানে তাকিয়ে দু-কথা কেউ জিজ্ঞেসও করে না।

এই চিন্তায় এক বছরেরও অধিক সময় ধরে সুলতানের একটা প্রচেষ্টাই অব্যাহত ছিল যে, আগে সঞ্চিত করতে হবে অধিকতর শক্তি, যাতে তাতারদের সাথে সামনের কোনো যুদ্ধে দেখিয়ে উঠতে পারেন—সেপাইদের নিয়ে যুদ্ধে নামা এই সেনাপতির শক্তি এখনো তোদের নাজেহাল করে ছাড়তে পারবে।

হ্যাঁ, দিল্লির সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের ন্যায়-ইনসাফ, পরহেজগারি, বীরত্ব ও সচ্চারিত্রিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন ও সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের মাঝে ছিল ঘৃণার এক বিশাল সমুদ্রের ব্যবধান। এর কারণ ছিল একটাই, সুলতান ইলতুৎমিশ তৎকালে জবরদস্ত সৈন্যদলের মালিক থাকা সত্ত্বেও কেবল নিজের কল্যাণচিন্তায় সুলতান জালালুদ্দীনকে যথাযথ সঙ্গ প্রদান করেননি। সুলতান জালালুদ্দীন পুরো উম্মাহর জন্য ভিখ চেয়ে ইলতুৎমিশের দরজায় এসে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু যখন ইলতুৎমিশের পক্ষ

---

[৪০] বানভুর, পৃষ্ঠা : ৩২

[৪১] জাহাঙ্গুশা, ২/১৪৮;

থেকে কোনো সাড়া পেলেন না, দিল্লি সাম্রাজ্যের প্রতি শক্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। দিন-দিন আরো বেড়েই চলল তার এই অসন্তোষের মাত্রা।

তারপর যখন পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিপুল পরিমাণ এলাকা তিনি দখল করে নিলেন, তখন নির্ভীকচিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, এখন ইলতুৎমিশের শাসনাধীন এলাকা তিনি আয়ত্ত করতে শুরু করবেন। প্রকৃতপক্ষে সুলতানের এই সিদ্ধান্ত ছিল অকল্যাণকর। ক'দিন পরের চিত্রপটই প্রমাণ করে দিল, সুলতান যদি এমন কিছু না করতেন, তবে হিন্দুস্থানে যেসব অঞ্চল তিনি জয় করে নিয়েছিলেন, সেখানে উত্তমরূপে নিজের অবস্থান গড়ে নেবার যথাযথ সুযোগ পেতেন।

## খানসারের যুদ্ধক্ষেত্র

সুলতান জালালুদ্দীন ও শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের মাঝে সংঘাতের শুরুটা ঘটেছিল খানসার রণক্ষেত্র থেকে। খানসার ছিল দিল্লির বাদশাহর শাসনাধীন সিন্ধুর একটি শহর। আজকাল এটাকে খিনসার বলে ডাকা হয়। এই জেলা 'থারপারকার' অঞ্চলে অমরকোটের পূর্বদিকে অবস্থিত। সুলতান জালালুদ্দীন তার সংক্ষিপ্ত সেনাদল নিয়ে শহর কবজা করার উদ্দেশ্যে খানসারের দিকে অগ্রসর হলেন। শহরের হাকিম সুলতানকে ভয় পেয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিল। ফলে কোনো রক্তপাতের দরকার পড়েনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান জালালুদ্দীন জানতে পারলেন, দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ বিরাট বড় সৈন্যবহর নিয়ে সুলতানের মোকাবেলার জন্য যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করেছেন। সুলতান জালালুদ্দীনও তখন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফলে ইসলামি বিশ্বের সীমান্তের এই দুই নিরাপত্তারক্ষী তরবারি হাতে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়ে গেলেন।

সুলতান ইলতুৎমিশের সেনাবাহিনীতে ছিল ১ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও তিনশ যোদ্ধা হাতি। বিপরীতে সুলতান জালালুদ্দীনের সৈন্যসংখ্যা ছিল অতি অল্প। সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যকেই সারিবদ্ধ করে জাহাঁ পাহলোয়ান উজবুককে (যে ছিল অগ্রগামী দলের সেনাপতি) সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ইলতুৎমিশের বাহিনীর অগ্রবর্তী দলও সম্মুখে এগিয়ে এল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দুপক্ষের অগ্রসেনারাই পথ হারিয়ে এদিক-সেদিক চলে গেল। ফলে নিয়মমাফিক সারিবদ্ধ যুদ্ধ আর সংঘটিত হল না।

তবে, শেষে দুইদলে অবশ্য ছোটখাট একটা সংঘর্ষ বেধেছিল। ঘটনা হল— যুদ্ধে সাধারণত যে-সমস্ত রীতি ফলো করা হয়, জাহাঁ পাহলোয়ান তা থেকে সরে এসে তার হাতের সৈন্যদলকে ইলতুৎমিশের পথ-হারানো সেনাদের ছাউনির ভেতর ঢুকিয়ে দিল। এতে ভেতরের এলোপাথাড়ি সংঘর্ষে মারা পড়ল দুই দলের কিছু লোক।[৪২]

---

[৪২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৬৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৭; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

## সন্ধি স্থাপন ও মনোমালিন্য দূরীকরণ

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ টের পেয়ে গেলেন যে, অবস্থা বড় সঙ্গিন। তাই সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা চালালেন তিনি। তার সমীপে চিঠি লিখলেন—আপনার অজানা থাকার কথা নয় যে, দীনের শত্রুরা আমাদের একদম মাথার উপর এসে গেছে। আপনি সুলতানুল মুসলিমিন ও ইবনুস সুলতান। আমার জন্য বৈধ নয় আপনার বিরুদ্ধে কারুর সহযোগী হয়ে ওঠা। আপনার মতো ব্যক্তিত্বের মোকাবেলায় তলোয়ার ধারণ করা আমার জন্য উচিত নয়। তবে নিজের প্রতিরক্ষার জন্য বাধ্য হতে হলে ভিন্ন কথা। আমি মনে করি, এহেন অবস্থায় আমাদের সন্ধি করে ফেলা উচিত। যদি আপনি পছন্দ করেন, আমি আমার কন্যাকে আপনার কাছে বিয়ে দেব। যাতে করে বিদূরিত হয়ে যায় দু'পক্ষের অসন্তোষ। আমার-আপনার মধ্যখানে বহাল থাকে বিশ্বস্ততা।'

সুলতান জালালুদ্দীন ইলতুৎমিশের এই পরামর্শপ্রদানমূলক চিঠি কবুল করে নিলেন। ফলে উম্মাহ্ সেদিন পরস্পরের রক্তপাত ঘটাবার মতো ভয়াবহ এক যুদ্ধ হতে বেঁচে গেল।

সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশ দিল্লিতে ফিরে যাবার সময় জালালুদ্দীনের দুই সরদার এযদিক পাহলোয়ান ও সানজার জক তাইসিকেও সঙ্গে করে নিয়ে নিলেন, যাতে পরস্পরের সম্পর্ককে মজবুত করে তুলতে এই দুজনের পরামর্শ ও সহযোগিতা লাভ করা যায়।[৪৩]

## খোরাসান ও ইরাকে তাতারদের নয়া লুটতরাজ

সুলতানের এই হিন্দুস্থানে অবস্থানকালে তাতাররা বেশি জোর ঢেলেছিল চীন ও ইউরোপের যুদ্ধাভিযানগুলোতে। ৬২১ হিজরিতে (১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ) তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বাহিনী, যা স্রেফ ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল, ফের একবার খোরাসান, পারস্য ও ইরাকের সেই শহরগুলিতে রাজত্ব করতে বেরোল, যেগুলি পশ্চিমা তাতারদের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল। অথবা প্রথম ধ্বংসকাণ্ডের পর যেখানে নতুন করে জনমানুষের বিচরণ দেখা যাচ্ছিল।

তাতারদের এই বাহিনী পারস্যে কুম, কাশান, হামাদান ও অন্যান্য শহরগুলোকে বাজেভাবে ধ্বংস করে দিল। তারপর তারা অগ্রসর হল রায় নগরীর দিকে। খাওয়ারিজমি বাহিনীর অনেক পথহারা সৈনিক সেখানে সমবেত হয়ে নতুনভাবে জনবসতি গড়ে তুলছিল। তাতাররা এসে এই বিধ্বস্ত অঞ্চলকে ফের একবার উজাড় করে দিল।

---

[৪৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৬৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৭; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯;

তাদের পরবর্তী আক্রমণটা নেমে এসেছিল তিবরিজ শহরের উপর। রায় শহরের পলাতক খাওয়ারিজমি সৈন্যদের মধ্য থেকে ৬ হাজার লোক প্রাণ বাঁচিয়ে এইখানে এসে পড়েছিল। তিবরিজের হাকিম ছিল উজবুক মুজাফফর বাহলোয়ান। প্রথম থেকেই তাতারদের ট্যাক্স প্রদান করে আসছিল সে। উজবুক এই খাওয়ারিজমিদের উপস্থিতিকে নিজের জন্য শঙ্খ শঙ্কার কারণ মনে করে বসল। তাতার-বাহিনী যখন তিবরিজের সীমানা-প্রাচীরের সামনে সেনাশিবির স্থাপন করে তাকে ধমকি পাঠাল, তখন সে আশ্রিত খাওয়ারিজমিদের অনেকের মস্তক নিজ হাতে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং বাকিদেরকে তাতারদের হাতে তুলে দিল জীবিত।

আল্লামা ইবনুল আসির এই ঘটনা বর্ণনা করে মুসলিমদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতার জন্য কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেছেন—এই তাতারদের ছিল মাত্র ৩ হাজার অশ্বারোহী। অথচ বিপরীতে পলাতক খাওয়ারিজমি সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার পদাতিক। এই ৬ হাজার-সহ উজবুকের বাহিনী ছিল অনেক বিশাল। তা সত্ত্বেও নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য না খাওয়ারিজমিরা কোনো হিম্মত করেছে, না উজবুকই করেছে কিছু![৪৪]

উপর্যুক্ত ঘটনাটি এই বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য যথেষ্ট যে, একজন দক্ষ কায়েদের অনুপস্থিতিতে কোনো বাহিনীই এমন শত্রুর সাথে কখনো টক্কর নিতে পারে না, যাদের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এরকম সংকটপূর্ণ মুহূর্তে সুলতান জালালুদ্দীনই ছিলেন কওমের নির্ভরতার সেই একমাত্র হাত, যিনি এই জেঁকে-বসা হতবিহ্বলতা থেকে তাদের উদ্ধার করতে পারতেন। তাতারদের এই সেনাদলের হত্যাযজ্ঞ ছিল আশু ঘটিতব্য তাদের নতুন কোনো আগ্রাসনের প্রারম্ভিকা। পারস্য ও ইরাকের মুসলিমরা অনুভব করে উঠছিল, এখন সুলতানকে হিন্দুস্থানের চেয়ে তাদেরই অধিক প্রয়োজন।

## দিল্লির রাজদরবারের প্রশস্ততা

হিন্দুস্থানের জমিনে সুলতান জালালুদ্দীন এক নয়া পৃথিবী আবাদ করে তুলেছিলেন। তিনি তখন পড়শি শাসকদের সাথে একটা উত্তম সম্পর্ক বজায় রেখে স্বীয় মিশনের প্রতি নিবিষ্ট হতে চাচ্ছিলেন। দিল্লির বাদশাহ শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশও ছিলেন সুলতানের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পুরোপুরি সচেষ্ট। কিন্তু বড় আফসোস, ইলতুৎমিশের দরবারের আমির ও সেনাপতিরা—যারা ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের ঘোর বিরোধী—তার এই কর্মকাণ্ডের সাথে একমত ছিল না। ফলে সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য প্রতিকূলই হয়ে রইল দিল্লির দরবার।

---

[৪৪] আল-কামিল, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬০৬-৬০৭